ছোটবড় সবার জন্যে

চিরকালের উপকথা

চিরকালের উপকথা

শংকর

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
—ফাল্গুন, ১৩৭১

প্রাপ্তিস্থান :
দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

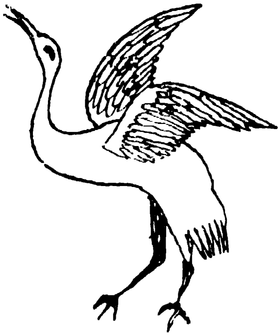
প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
নিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০০০৬

উপদেষ্টা :
নিতাই মল্লিক

শ্রীহারাধন চক্রবর্তী-কে
বড় হয়েও যাঁর মন এখনও
ছোটদের মতন রয়েছে।





> সাবধান !
> ছোটদের বকাবকি এ-বাড়িতে সম্পূর্ণ নিষেধ।

টাটানগর থেকে অনেকদিন পর কলকাতায় মামাবাড়িতে বেড়াতে এসে বুলবুলের সবচেয়ে ভাল লেগেছে এই নোটিসটা।

দাদুর নির্দেশে ছোটমাসিমা নিজে ঝকঝকে কালিতে মুক্তোর মতো হাতের লেখায় এই বিজ্ঞপ্তিপত্র রান্নাঘরের দরজার কাছে দেওয়ালে এঁটে দিয়েছেন। জায়গাটাও খুব ভাল হয়েছে, কারণ রান্নাঘরের সামনে কুটনো কোটার ওই জায়গাতেই মা এবং মাসিরা নানা কাজকম্মো নিয়ে সারাক্ষণ বসে থাকেন। ছোটদের ওপর একটুতেই তাঁরা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন।

নোটিসটা পড়ে মা ও মাসিমারা প্রথমে ভেবেছিলেন রসিকতা। কেউ যেন দাদুর সঙ্গে কথা না-বলেই স্রেফ ওঁদের ঠকাবার জন্যেই

১

বিয়েবাড়িতে এই বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে দিয়েছে। ছোটমাসিমা আর্ট কলেজে চলে গিয়েছেন, আজ তাঁর পরীক্ষা আছে। তখন বাধ্য হয়ে ছোটমামাকেই ছোটরা ধরে বসলো, মা এবং মাসিদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে।

ছোটমামা বাড়ির প্রত্যেককে সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীরভাবে জানিয়ে দিলেন, "ব্যাপারটা মোটেই রসিকতা নয়। বাবা নিজেই এই অর্ডার দিয়েছেন। ছোটদের কোনোরকম বকাবকি করতে হলে অবশ্যই দোতলায় গিয়ে তাঁর অনুমতি নিতে হবে।"

তিলক, শিবাজী এবং বুলবুল ব্যাপারটায় খুব খুশি—কোন্ সেই ভিলাই, রাউরকেলা আর টাটানগর থেকে তারা ছোটমামার বিয়ে অ্যাটেণ্ড করবার জন্যে কলকাতায় এসেছে। এখানে এসে যদি স্বাধীনতা না-থাকে, যদি সব সময় বড়দের বকুনি খেতে হয়, তা হলে নিজেদের বাড়ির সঙ্গে মামার বাড়ির কী তফাত রইলো? সুতরাং হিপ-হিপ-হুররে। থ্রী চীয়ার্স ফর…এখানে বুলবুল বলতে যাচ্ছিল—ছোটমাসি, ছোটমামা অ্যাণ্ড দাদু। কিন্তু তিলক ও শিবাজী কিছুটা স্লোগান পাল্টে দিয়ে খুশ-মেজাজে গলা দিলো: "থ্রী চীয়ার্স ফর দেবলা সেন, থ্রী চীয়ার্স ফর সুবিমল সেন…অ্যাণ্ড থ্রী চীয়ার্স ফর সুনির্মল সেন।"

বুলবুলের মা এবং মাসিরা কিন্তু একটুও সন্তুষ্ট নন। তাঁরা মুখ ব্যাজার করে বললেন, "মোটেই ভাল করছো না, সুবিমল। শাসন ছাড়া এইসব জাঁহাবাজ ভাগ্নে-ভাগ্নিদের কন্ট্রোলে রাখা অসম্ভব। তোমাদের এই বিজ্ঞপ্তির সুযোগ নিয়ে এরা অরাজকতা বাধিয়ে বসবে।"

বড়মাসিমা তো আরও একপা এগিয়ে গেলেন। "উঃ, ছোট ভায়ের বিয়েটা তিলকের পরীক্ষার সময়ে হলেই ভাল হতো। দুষ্টুটাকে বাড়িতে ফেলে রেখে আমি একা চলে আসতে পারতাম। হিসট্রির বালগঙ্গাধর তিলক কত শান্ত ভদ্রলোক ছিলেন, আর আমাদের এই তিলক?"

"দোষটা তাহলে ছোটমামারই," চটপট উত্তর দিলো তিলক।

"উঃ! দেখো কী দুষ্টু! তুই যে ওর নাম দিয়েছিলি তা ঠিক মনে রেখে দিয়েছে।" বড়মাসি অমলা বসু অবাক হলেন।

বুলবুলের মেজোমাসিমা মেখলা রায় চোখ দুটো বড়-বড় করলেন এবং জানালেন, "এইসব দামাল ছেলেমেয়ের অত্যাচারে দামী জিনিসপত্তর যদি ভেঙে যায়, হৈ-চৈতে বাড়িতে যদি কাক-চিল না বসে, আমার ব্লাডপ্রেসার যদি বাড়ে এবং বিয়েবাড়ির কাজে বাধা পড়ে তা হলে আমাকে অন্তত দোষ দিও না।"

শিবাজী রায় এতোক্ষণ গম্ভীরভাবে কথাগুলো শুনছিল। এবার সে মুখ খুললো: "বকবার এবং মারবার যদি এতোই ইচ্ছে, তা হলে ওপরে চলে যাও না! দাড়িওলা বাবা তো মেজোমেয়ের কথা শুনবার জন্যেই ইজিচেয়ারে বসে আছেন।"

"কী সব পাজি ছেলে দেখো!" বললেন শিবাজীর মা। বাবার কাছে গিয়ে নাতিদের নামে অভিযোগ করে যে বিশেষ ফল হবে না, তা বুঝেই বোধহয় মেখলা রায়ের গলা একটু নরম হয়ে এলো। তিনি বললেন, "তোমরা যদি খুব বেশি দস্যিপনা করো তা হলে আমরা অবশ্যই ওপরে যাবো।"

ছোটমামা কিন্তু হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন। "বাবার কাছে যাবার সাহস তোমাদের হবে না, দিদি। আর গেলেও খুব কিছু লাভ হবে না। বাবা বলছিলেন, 'সমস্ত জীবন ভুল করে এসেছি —বকাবকি করে কোনো কাজ হয় না'।"

তিলকের মা কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, "নিজের ছেলেমেয়েরা তো মানুষ হয়ে গিয়েছে, তাই বাবা এখন ওসব কথা বলছেন। বকাবকি ছাড়া ছেলেমেয়ে মানুষ করা সম্ভব নয়।"

বুলবুল, তিলক ও শিবাজী অধীর আগ্রহে ছোটমামার দিকে তাকালো। ছোটমামা এবার কী বলেন তার ওপর অনেককিছু নির্ভর করছে।

"ছোটমামা, প্লীজ, মাসির কথায় মত পাল্টিও না," মনে-মনে প্রার্থনা করছে বুলবুল।

প্রার্থনাতেই বোধহয় ফল হলো। ছোটমামা বললেন, "বড়দি, তোমার তা হলে তো সুইজারল্যাণ্ড যাবার কোনো চান্স রইলো না।"

"কেন? আমি কী দোষ করলাম? সুইসরা তো খুবই ভাল লোক। বিদেশী অতিথিকে দেশ দেখাতে আপত্তি করে না।" বললেন বড়মাসিমা।

"ওপরে বাবার কাছে গিয়েই শোনো।" ছোটমামা সত্যিই আজ ভাগ্নে-ভাগ্নিদের জন্যে খুব ফাইট করছেন।

এবার একখানা বোমা ফাটালেন ছোটমামা। "বাবা বলছিলেন, ছেলেদের মারধোর এবং বকাবকি সুইজারল্যাণ্ডে আইন

পাশ করে তুলে দেওয়া হয়েছে। ছেলেমেয়েদের কিছু বললেই সঙ্গে-সঙ্গে পুলিস এসে…”

আর বলতে হলো না। ভাগ্নি ও ভাগ্নেরা আনন্দে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

ছোটমামার তিন দিদি গোমড়া মুখে ভাইকে বললেন, “খুব অন্যায় করছো তুমি…এদের সামনে এইসব গোপন খবর ফাঁস করাটা মোটেই ভাল হচ্ছে না।”

এরপর সেন-বাড়িতে ছোটদের একটানা আনন্দমেলা শুরু হয়ে গেলো। যা প্রাণ চায় তাই করে চলেছে তারা ; বড়রা কেউ কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না।

অমন যে গম্ভীর দাদু যিনি কোনোরকম হৈ-হৈ হট্টগোল সহ্য করতে পারেন না, তিনিও বললেন, “কই ? এতো বড় বাড়ির তুলনায় কোনো গোলমাল তো নেই। হৈ-হৈ না-হলে কি বিয়ে হয় ?”

বিয়েবাড়ির এই মজার জন্যেই তো বুলবুল, তিলক ও শিবাজী এতোদিন, যাকে বলে কিনা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। তিলক থাকে রাউরকেলায়, শিবাজী ভিলাইতে এবং বুলবুল জামশেদপুরে! এদের অত্যাচারে তিতিবিরক্ত হয়ে বুলবুলের মা প্রমীলা চৌধুরী বললেন, “এরই নামই ‘তেরোস্পর্শ’—যতসব গোলমাল।”

“তেরোস্পর্শ কী জিনিস ছোটমামা ? কাউকে তেরোবার টাচ করা ?” জিজ্ঞেস করেছে ইংরিজী মিডিয়াম ইস্কুলের ছাত্র শিবাজী।

হেসে ফেললেন ছোটমামা। "ভানলাকি থার্টিনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। মূল কথাটা হচ্ছে ত্র্যহস্পর্শ—বিশেষ একদিনে তিন তিথির মিলন—ত্রি+অহন্+স্পর্শ। যোগটা নাকি তেমন ভাল নয়।"

তিলক এবার চোখ দুটো বড় বড় করলো। "ও বুঝেছি!"

"কী বুঝেছিস?" খ্যাঁক করে উঠলেন তিলকের মা।

"ঠিক বুঝেছি—বুলবুল, শিবাজী ও আমার এই এক জায়গায় দেখা হওয়াটা ভাল নয়—আমরা হলাম কিনা ত্র্যহস্পর্শ।"

এরপর ছোটমামা নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন। ছোটমামার ঘরের ভেতরটা যেন কেমন! গাদা গাদা বই এবং খাতা। বিছানার ওপরেও বই। দু-তিনখানা টেপরেকর্ডারও সব সময় ছোটমামার বিছানার ওপর পড়ে থাকে। আর আছে ডজন ডজন ফোটো।

এই ঘরে এসে নতুন ছোটমামীমা কোথায় শোবে রে বাবা! বুলবুল ভেবেই পায় না।

বুলবুল শুনেছে, ছোটমামা ক্যামেরা এবং টেপরেকর্ডার হাতে কত জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। মা নিজের মুখে বলেছেন, "তোর মামার অদ্ভুত চাকরি। গাঁয়ে গাঁয়ে গপ্পো সংগ্রহ করে বেড়ায়।" লোকের কাছে বসে, তাদের গপ্পো শুনে বাক্সবন্দী করে চলেছেন ছোটমামা, এর নাম নাকি গবেষণা—ফোকলোর রিসার্চ।

বুলবুলের মা নিজেও ব্যাপারটায় তেমন সন্তুষ্ট হন নি।

বুলবুলের বাবাকে তিনি বলেছিলেন, "কী জানি বাবা! বছরের পর বছর গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে গপ্পো জোগাড় করা, এ আবার কী কাজ? এতে কার কী উপকার হবে? গেঁয়ো-চাষীদের বস্তা-পচা গপ্পো কে শুনবে?"

বুলবুলের বাবা বলেছিলেন, "না গো, খুব দরকারী কাজ। সমস্ত বড় বড় দেশে মহা মহা পণ্ডিতরা সারা জীবন ধরে এই সব রূপকথা এবং উপকথা সংগ্রহ করছেন—একটা দেশকে ঠিক মতো জানতে হলে, এই সব গপ্পো ছাড়া কোনো উপায় নেই। গ্রামগঞ্জের গপ্পের মধ্যেই দেশের মানুষদের সুখ-দুঃখের ছায়া ধরা পড়ে। কী তারা চায় এবং কী চায় না তাও জানা যায়।"

"রাখো তুমি!" বকুনি লাগিয়েছিলেন বুলবুলের মা। "গাঁয়ে গাঁয়ে মাসের পর মাস এইভাবে ঘোরা কত কষ্টের বলো তো? আর যে-লোক আদাড়ে-বাদাড়ে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায় তাকে কে বিয়ে করবে?"

সে সমস্যা অবশ্য মিটেছে। ছোটমামার বিয়ের বাদ্যি বেজেছে। নতুনমামীমাও যে এই গপ্পো খোঁজার গবেষণায় আছেন তা শুনেছে বুলবুল। নতুনমামীমার নামটাও ফাইন—চিত্রলেখা মজুমদার।

ছোটমামা ঘরের দরজা ভেজিয়ে টেপ চালিয়ে কীসব লিখতে শুরু করেছিলেন। সেই সময় তিন পার্টিকে নিয়ে তিন দিদি হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লেন।

তিলকের মা বললেন, "ছোটদের এ-বাড়িতে কিছু বলা চলবে না ফতোয়া জারি করে বেশ তো ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে রয়েছিস। এদিকে আমাদের অবস্থা সঙ্গিন।"

শিবাজীর মা জোর গলায় বললেন, "সত্যি অসহ্য হয়ে উঠেছে। একটু আগে দুধের কড়ায় টেনিস বল পড়েছে। এক লিটার দুধ নষ্ট হলো। এতো লোকের চা হবে কী করে?"

বুলবুলের মা অভিযোগ করলেন, "দুষ্টুদের পাল্লায় পড়ে বুলবুলের দুষ্টুমিও বেড়েছে। তিনটে নতুন কাপডিশ পায়ের ধাক্কায় ভেঙেছে। বাবাকে বলতে গেলাম। বাবা ওকে কিছুই বললেন না, উপরন্তু আমাকে শুনিয়ে দিলেন : শোন্, একবার এইভাবে দামি কাপডিশ ভাঙার পরে স্বামী বিবেকানন্দ কী বলেছিলেন। কাপডিশ তো ওইভাবেই যাবে—ওরা কী কলেরা বসন্তয় মরবে?"

"কী? তোমরা দুষ্টুমি করেছো?" আদরের ভাগ্নি ও দুই ভাগ্নেকে জিজ্ঞেস করলেন ছোটমামা।

"একটু-একটু," তিনজনের মুখপাত্র হয়ে তিলক উত্তর দিলো :

"একটু একটু?" তীব্র প্রতিবাদ জানালেন শিবাজীর মা। "সমস্ত বাড়িঘরদোর তছনছ করেছে। মনে হবে যেন একটু আগেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখানে।"

বুলবুলের মা এবার ছোটমামাকে বললেন, "শোনো সুবিমল, আমি, মেজদি এবং বড়দি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তুমি যা-হয় একটা ব্যবস্থা করো।"

বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা অবশ্য রসিকতা।

তিলকের মা বললেন, "আমরা যাচ্ছি তোমার বউয়ের বেনারসী কাপড় কিনতে এবং সেই সঙ্গে বেশ কয়েকটা নেমন্তন্ন সারতে। বিয়ের তিনদিন বাকি, অথচ এখনও অর্ধেক নেমন্তন্ন বাকি। আর দেরি হলে আত্মীয়স্বজন কেউ নেমন্তন্ন নেবে না। আমরা কাঞ্জিলালের দোকান থেকে বেনারসী শাড়ি কিনেই চিঠি বিলোতে বেরুবো। টালার ছোটদাদু থেকে টালিগঞ্জের মেসোমশাই, বৌবাজারের কাকিমা থেকে ব্যাণ্ডেলের বউঠাকরুণ পর্যন্ত কেউ এখনও চিঠি পান নি। এখন যদি এই তেরোস্পর্শ না-সামলাও তাহলে তোমার বিয়ে বন্ধ।"

"এরা থাকুক না আমার কাছে," ছোটমামা মোটেই ভয় পাচ্ছেন না।

"বুঝবে মজা! দেখি কেমন বিনা বকুনিতে এই দস্যুদের সামলে রাখতে পারো!" এই বলে বড়মাসিমা, মেজোমাসিমা এবং অন্য সকলে বিদায় নিলেন।

ছোটমামা, অর্থাৎ মিস্টার সুবিমল সেন এবার ভাগ্নে-ভাগ্নি টীমের দিকে তাকালেন। অহিংস উপায়ে এদের সামলানো যে খুব সোজা কাজ নয় তা বোধহয় বুঝতে তাঁর অসুবিধা হচ্ছে না।

রাউরকেলার তিলক ইতিমধ্যেই ছোটমামার টেপরেকর্ডারটা হাতে তুলে নিয়ে ঝাঁকাতে শুরু করেছে। সে শুনেছে, প্রত্যেক টেপরেকর্ডারের মধ্যে একটা লিলিপুট মানুষকে ঢুকিয়ে রাখা হয়।

হাঁ-হাঁ করবার আগেই দেখা গেলো তিলক টেপরেকর্ডারের

কয়েকটা নাট-বল্টু খুলে ফেলেছে।

বুঝিয়ে-সুঝিয়ে টেপরেকর্ডার ফেরত নিতে-নিতে ছোটমামার নজর পড়ে গেলো শিবাজীর দিকে। মাস্টার শিবাজী রায় ততক্ষণে রঙিন ফেল্টপেন নিয়ে নতুনমামীমার ছবিটায় গোঁফ এঁকে ফেলেছে।

"উঃ, কী ফার্স্ট ক্লাস দেখাচ্ছে নতুনমামীমাকে, উইথ গোঁফ।" বুলবুল ইন্ধন জোগালো।

"ওয়ান মিনিট মামু। আরও ভাল করে দিচ্ছি—মামীর কপালে দুটো শিঙ বেরিয়ে যাবে এখনই।" বললো শিল্পী শিবাজী রায়। ভিলাইনগর কালীবাড়িতে 'বসে-আঁকো চিত্রপ্রতিযোগিতা'য় সে সদ্য প্রথম পুরস্কার পেয়েছে।

এসব দৌরাত্ম্য কী করে বন্ধ করা যাবে ভেবেই পাচ্ছেন না ছোটমামা। বাবার নিষেধ না থাকলে এতোক্ষণে প্রত্যেকেই প্রচণ্ড বকুনি খেতো।

ছোটমামা এবার অন্য মতলব ভাঁজলেন। বুলবুলকে জিজ্ঞেস করলেন, "গপ্পো শুনবে?"

তিনজনের মুখচোখ দেখেই সুবিমল সেন বুঝলেন গপ্পো শুনবার জন্যে সবাই উন্মুখ।

"তোমরা সবাই চুপচাপ বসে থাকবে তো? কোনো জিনিসে হাত দেবে না?" ছোটমামা একবার ব্যাপারটা ঝালিয়ে নিলেন।

"ভাল ভাল গপ্পোগুলো বলবে কিন্তু, ছোটমামা।" বুলবুল স্পেশাল অনুরোধ করলো।

"খুব মন দিয়ে শুনতে হবে কিন্তু।" সঙ্গে সঙ্গে ছোটমামা শর্ত আরোপ করলেন।

"কেন ?" তিলকের মনের মধ্যে সন্দেহ জাগছে গল্পের লোভ দেখিয়ে ছোটমামা অন্য কোনো ফন্দি আঁটছেন কিনা।

ছোটমামা বললেন, "গল্পের শেষে প্রশ্ন করা হবে—তার উত্তর চাই। উত্তর অনুযায়ী পুরস্কার—ফার্স্ট, সেকেণ্ড এবং থার্ড।"

শিবাজী সাবধান করে দিলো, "মামু, বানানো গপ্পো নয় কিন্তু—সত্যি গপ্পো ছাড়া আমরা শুনবো না।"

ছোটমামা পড়লেন ফ্যাসাদে। কিন্তু ত্র্যহস্পর্শ সামলাবার জন্যে বললেন, "এসব গপ্পো তো আমার বানানো নয়—গপ্পের জঙ্গল থেকে কয়েকটা দুর্দান্ত বুনো গপ্পোকে ধরে আনা হয়েছে, এখনও পোষ মানানো হয়নি।"

বুনো হাতির মতো বুনো গপ্পোর ব্যাপারটা বুলবুলের খুব ভাল লাগলো। সে বললো, "মামা, গপ্পোকেও পোষ মানাতে হয় বুঝি ?"

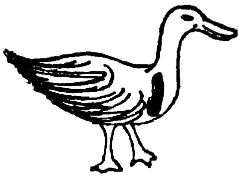
"অবশ্যই। বুনো গপ্পো শহুরে লেখকদের মনের চিড়িয়াখানায় বন্দী থেকে থেকে অনেক সময় নির্জীব হয়ে যায়—তোমরা চিড়িয়াখানায় দেখোনি ? খাঁচায় আটকানো এক একটা পশুর কী প্যাথেটিক অবস্থা !"

শিবাজী আবার ওই সত্যি-মিথ্যের ব্যাপারে ছোটমামার ওপর চাপ দিলো। বানানো গল্প থেকে সত্যি গল্পের স্বাদ অনেক ভাল।

ছোটমামা বললেন, "বিভিন্ন দেশ ঘুরে-ঘুরে আমি ও চিত্রলেখা, অর্থাৎ তোমাদের নতুনমামীমা গপ্পো সংগ্রহ করি—গ্যারান্টি-দেওয়া সত্যি গপ্পো! এই সব উপকথা তো কারুর কলম থেকে বেরিয়ে আসেনি। একশো দুশো চারশো পাঁচশো হাজার বছর ধরে বিভিন্ন কাহিনী লোকের মুখে-মুখে ঘুরছে—একদম খাঁটি দুধ না-হলে কিছুতেই এতো লম্বা পরমায়ু হতো না এই সব উপকথার।"

ছোটমামা লক্ষ্য করলেন তিন-পার্টিই কোনোরকম ঝামেলা না-পাকিয়ে শান্ত হয়ে তাঁর কথা শুনছে। হৈ-হল্লা একেবারে বন্ধ।

তিনি আবার মাথা চুলকোতে লাগলেন। বললেন, "উপকথা কি একটা! হাজার হাজার লাখ লাখ উপকথা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে—সেকালের বাঘ সিংহ সাপ বাঁদর থেকে আরম্ভ করে রাজা-রাজড়ারা যা-সব কাণ্ড করে গিয়েছেন! ভাবছি তোমাদের কোন্ গপ্পোটা বলি।"



বুলবুল রিকোয়েস্ট করলো, "রাজার গপ্পো বলো, ছোটমামা। রাজাদের আমার খুব ভাল লাগে। আমি একটা মাত্র রাজা দেখেছি।"

"রাজা! কোত্থেকে দেখলি, বুলবুল? ইণ্ডিয়া থেকে রাজা তো উঠে গিয়েছে," শিবাজী বেশ জোরের সঙ্গেই বললো।

"বললেই হলো উঠে গিয়েছে! আমি নিজের চোখে দেখেছি। রাজা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছিল, আমাকে জিজ্ঞেস করল, কী খুকি, কী নাম তোমার?"

"ইমপসিবল।" চিৎকার করে উঠলো তিলক। "রাজারা কখনও বিড়ি খান না। তাঁরা গায়ে সন্দেশ মেখে দুধে চান করেন। লুচি দিয়ে তাঁদের গা মোছানো হয়। সোনার বাটি থেকে তাঁরা রাবড়ি খান।"

গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠলো। কিন্তু বুলবুল জানিয়ে দিলো, জামশেদপুরে গতবারের পুজোয় সে যাত্রা দেখতে গিয়েছিল এবং সেখানেই রাজাকে বিড়ি খেতে দেখেছে সে।

বুলবুলের দুই মাসতুতো ভাই খুব হাসলো। বললো, "তুই এখনও বোকা আছিস। যাত্রার রাজা আর আসল রাজা এক নয়।"

বুলবুল একমত নয়। "রাজা ইজ রাজা—সে যেখানকারই হোক।"

"ঠিক আছে, এবারে এক মস্ত রাজার কাণ্ডকারখানা শোনো। ইনি যাত্রা-থিয়েটারের রাজা নন, জেনুইন সিংহাসনে-বসা সোনার মুকুট-পরা দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজামশায়।"

ছোটমামা আরম্ভ করলেন, "এই রাজার গপ্পোটা জোগাড় করেছিলাম তামিলনাড়ুর এক গ্রাম থেকে। প্রথমে ভেবেছিলাম, এও বুঝি মানুষের মনগড়া রাজা, বানানো কোনো গপ্পো। কিন্তু পরের পর দশটা গ্রামে গিয়ে একই রাজার কথা শুনলাম। তখন বুঝলাম, ইনি নিশ্চয় কোনোকালে রাজত্ব করেছিলেন, না-হলে এতো লোক এখনও কী করে তাঁর কাণ্ডকারখানা মনে রেখে দিয়েছে?"

ছোটমামা বললেন, "দক্ষিণদেশের এই রাজা মস্ত নরপতি। তাঁর হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, রাজকোষে থান ইট-সাইজের থাক-থাক সোনা আর বস্তা-বস্তা হীরে-মানিক-মুক্তো।"

তিলক বললো, "তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ইয়া বড় রাজা! নিশ্চয় রাজার বিরাট গোঁফ এবং কোমরে ঝকঝকে তলোয়ার।"

"ঠিকই ধরেছো তোমরা," ছোটমামা উত্তর দিলেন। "আগেকার রাজাদের এই এক সুবিধে। একটু বর্ণনা দিলে সবাই বুঝে নেয়, কী রকম রাজা।"

"তারপর রাজার কী হলো?" জিজ্ঞেস করলো শিবাজী।

"ভীষণ কিছু একটা হবেই। অত ছটফট করিস না,"

শিবাজী।" ধমক দিলো তিলক।

মামা শুরু করলেন, "যা বলছিলাম, হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, কিন্তু রাজার মগজে..."

একটু থেমে মামা প্রশ্ন করলেন, "বোকা হলে মগজে কী থাকে?"

"গোবর," তিনজন গল্প-শুনিয়ে একই সঙ্গে উত্তর দিলো।

ছোটমামা বললেন, "গাঁয়ে-গাঁয়ে খোঁজখবর নিয়ে আমি জানলাম, সত্যিই মাথা-মোটা এই রাজা। অথচ সমস্ত বোকার মতোই এই রাজার ধারণা তাঁর থেকে বুদ্ধিমান নরপতি ত্রিভুবনে নেই।

আরও এক মুশকিল—রাজার স্তাবকরা প্রতিদিন রাজসভায় বলেন, মহারাজ, আপনার মতো বুদ্ধিমান বিচক্ষণ সম্রাট পৃথিবীতে এখনও জন্মাননি। রাজাও খুশমেজাজে সেসব কথা শোনেন এবং বিশ্বাস করেন তাঁর মতো বুদ্ধি ভগবান কাউকে দেননি।

কিন্তু বুদ্ধি না-থাকলে এই পৃথিবীতে কাজ চালানো খুব শক্ত। দেশের রাজা বোকা হলে দেশ চলাই কঠিন হয়ে ওঠে।"

"রাজা কী রকম বোকা ছিল, মামা?" বুলবুল জিজ্ঞেস করলো।

ছোটমামা বললেন, "প্রত্যেকদিন রাজার বোকামির নমুনা পেয়ে-পেয়ে প্রজাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাদের ভোগান্তি বেড়েই চলছে। রাজার বোকামি কীরকম ছিল তার একটা নমুনা শোনো।

ওই রাজত্বে একজন মাদ্রাজী ব্যবসাদার ছিলেন, তাঁর নাম অঙ্গুচেট্টি। এই অঙ্গুচেট্টির অনেক রোজগার ছিল, কিন্তু পয়সা হাতে পেলেই তিনি খরচ করে ফেলতেন। একবার প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিতে অঙ্গুচেট্টির বাড়ি ভেঙে পড়লো।

কিছু টাকাকড়ি জোগাড় করে বেচারা অঙ্গুচেট্টি বাড়ির দেওয়াল সারিয়ে নিলেন।"

"অঙ্গুচেট্টির বাড়ি কী রকম মামা?" জিজ্ঞেস করলো বুলবুল।

ছোটমামা বললেন, "ভাল প্রশ্ন করেছো। বোকা রাজার হুকুম, তাঁর রাজ্যে তিনি ছাড়া আর কেউ পাকা বাড়িতে থাকতে পারবে না। ফলে রাজপ্রাসাদ ছাড়া সমস্তই মাটির বাড়ি।"

এবার কাহিনী তরতর করে এগিয়ে চললো—অঙ্গুচেট্টি রাজমিস্ত্রি ডাকিয়ে ঝড়ে-ভাঙা বাড়ি তো সারিয়ে নিলেন। কিন্তু তারপরেই আসল বিপদ ঘটলো।

এক সিঁদেল চোর ঠিক করলো সে অঙ্গুচেট্টির বাড়িতে চুরি করবে। গভীর রাত্রে সিঁদকাঠি নিয়ে অঙ্গুচেট্টির মাটির বাড়ির দেওয়ালে সে মস্ত এক গর্ত করলো। ইচ্ছেটা ছিল, ওই গর্তর মধ্য দিয়ে বড়-বড় সিন্দুক চুপি চুপি বাইরে পাচার করে দেবে। ঘুমের ঘোরে অঙ্গুচেট্টি কিছুই বুঝতে পারবেন না।

কিন্তু চোরের ভাগ্য খারাপ! লোভের মাথায় দেওয়ালে মস্ত গর্ত কাটতে গিয়ে সে নিজের বিপদ ডেকে আনলো—হুড়মুড় করে সমস্ত দেওয়ালটাই ভেঙে পড়লো এবং সকালবেলায় দেখা গেলো মাটিতে চাপা পড়ে নিজের খোঁড়া গর্তের মধ্যে চোর মরে পড়ে আছে।

পড়শিরা ভাবলো, যাক, যেমন পাজি চোর তেমন যোগ্য শাস্তি হয়েছে। অঙ্গুচেট্টিও ভাবলেন, তাঁর কপালের জোর, একটুর জন্য যথাসর্বস্ব রক্ষা পেয়েছে।

ছোটমামা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা এবিষয়ে কী ভাবছো ? বলো।"

তিলক বললো, "টিট ফর ট্যাট! চুরি করতে গিয়ে চোর নিজেই শাস্তি পেয়েছে। ভালই হয়েছে।"

শিবাজীর মতামত : "কত পাজি চোর তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না—রাত্রে যারা চুরি করতে বেরোয়, তাদের সঙ্গে ছোরা এবং বোমা থাকে। মিস্টার অঙ্গুচেট্টির ভাগ্য ভাল যে তখন তিনি ঘুমিয়েছিলেন। চোরকে বাধা দিতে গেলে নিজেই জখম হতেন।"

ছোটমামা বললেন, "অঙ্গুচেট্টির ভাগ্য যে ভাল নয় তা পরের দিনই বোঝা গেলো। ওই যে চোর তার এক মাসতুতো ভাই ছিল, সেও চোর। তোমরা তো জানোই, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই! মাসতুতো চোর ভাবলো ভাইয়ের এমন বেঘোরে মৃত্যু চুপচাপ মেনে নেওয়া ঠিক হবে না। এর একটা প্রতিবিধান চাই।

মাসতুতো চোর সেদিন চুরি করতে না বেরিয়ে নিজের ব্রেন খাটাতে বসলো। চোর ভাবলো, দেশে যখন বোকা রাজা রয়েছেন তখন একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবার চান্স রয়েছে।

মাসতুতো চোর আর সময় নষ্ট না-করে ছুটলো বোকা রাজার কাছে।

নতজানু হয়ে রাজাকে প্রণিপাত করে সে বললো, "মহারাজ,

আমার মাসতুতো ভায়ের মাথার ওপর ওই অঙ্গুচেট্টির দেওয়াল ভেঙে পড়ে সর্বনাশ হয়েছে। আমার মাসতুতো দাদা অকালে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।" এই বলে সে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

"মহারাজ, আপনি যে-দেশের রাজা, সে দেশে এতো বড় অন্যায় তো হতে পারে না। আপনি ওই অঙ্গুচেট্টিকে ফাঁসিতে ঝোলান।"

বোকা রাজা খুব রেগে উঠলেন। বললেন, "আমার রাজ্যে সবাই, এমনকি চোররাও নিরাপদে থাকবে। এই অপঘাত মৃত্যু আমি সহ্য করবো না। এর বিচার হবেই।"

বেচারা অঙ্গুচেট্টি আগের রাত্রে চুরির হাত থেকে বেঁচে গিয়ে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছিলেন, ঠিক সেই সময় রাজার সেপাই তাঁকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেলো।

সেপাই বললো, "বড়ো বাড় বেড়েছো তুমি, অঙ্গুচেট্টি! মহারাজের রাজত্বে লোকের বেঘোরে মৃত্যু! চলো এখনই তুমি রাজার কাছে!"

অঙ্গুচেট্টি কাঁপতে-কাঁপতে রাজসভায় হাজির হলেন। সেখানে গিয়ে অঙ্গুচেট্টির তো চক্ষু চড়কগাছ। অঙ্গুচেট্টি দেখলেন, রাজার সিংহাসনের কয়েক গজ দূরেই রয়েছে ফাঁসিকাঠ। মহারাজ রাজকার্যে কোনোরকম দেরি পছন্দ করেন না। বিচারে ফাঁসির হুকুম হলে সঙ্গে-সঙ্গে তা কার্যকরী করার জন্যেই সিংহাসনের সামনেই ফাঁসিকাঠ খাড়া করে রেখেছেন।

অঙ্গুচেট্টি এবার মহারাজের দিকে তাকালেন এবং দেখলেন, মহারাজ রেগে আগুন হয়ে রয়েছেন। তাঁর চোখ দুটো তামাকের কল্কেতে টিকের আগুনের মতো জ্বলছে।

মহারাজ অভ্যেসমতো একবার গোঁফে তা দিলেন। তারপর আড়চোখে ফাঁসিকাঠের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার দয়ার সুযোগ নিয়ে রাজ্যে অব্যবস্থা, অন্যায় এবং অশান্তি বড্ড বেড়েছে। এবার আমি কঠোর হাতে দেশ শাসন করবো। যার যা শাস্তি তা নগদ-নগদ দিয়ে দেবো। আমি দেখছি ছোটখাট শাস্তিতে কোনো ফল হয় না, প্রজারা তাতে কোনো শিক্ষাই পায় না। সুতরাং মাথা খাটিয়ে ঠিক করলাম, যত ফাঁসিতে ঝোলাবো তত দেশের উন্নতি হবে।"

অঙ্গুচেট্টি বোকা রাজার হাবভাব দেখে ততক্ষণে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছেন। তিনি বুঝতে পারছেন, তুচ্ছ কারণেও মহারাজ তাঁকে ফাঁসিকাঠে না-চড়িয়ে ছাড়বেন না।

মহারাজ এবার অঙ্গুচেট্টির দিকে তাকালেন। বললেন, "তোমার বিরুদ্ধে খুবই সিরিয়াস অভিযোগ। ফাঁসি ছাড়া এক্ষেত্রে বোধ হয় অন্য কোনো পথ নেই।"

"মহারাজ, আমি নির্বিরোধী ব্যবসাদার। কারও সাতে-পাঁচে থাকি না। আমি তো কোনো দোষ করি নি।"

"হুম!" এবার হুঙ্কার ছাড়লেন মহারাজা। "দোষ করেছো কি না-করেছো তা ঠিক করবো আমি। কেন তুমি বাড়ির দেওয়াল ভিজে রেখেছিলে? এই ভিজে দেওয়াল চাপা পড়ে কেন সিঁদেল

চোর বেঘোরে মারা গেলো? তুমি কি ভেবেছো আমার রাজত্বে এই অনাচার মুখ বুঁজে সহ্য করা হবে?"

মহারাজের হুঙ্কার শুনে ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগলেন অঙ্গুচেট্টি। তিনি বুঝলেন, মহারাজের সঙ্গে তর্ক করতে গেলে বেঘোরে প্রাণটা যাবে। তার থেকে অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে অন্য কোনো ফন্দি আঁটাই ভাল।

অঙ্গুচেট্টি এবার সাষ্টাঙ্গে মহারাজকে প্রণাম করলেন।

ছোটমামা এক মিনিটের জন্যে থামলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "এই সাষ্টাঙ্গ ব্যাপারটা তোমরা জানো?"

বুলবুল, তিলক, শিবাজী তিনজনেই মাথা চুলকোতে লাগলো। শিবাজী বলল, "খুব সম্ভব মাটিতে শুয়ে পড়ে প্রণাম করা—একেবারে টপ রেসপেক্ট দেখানো আর কী!"

ছোটমামা বললেন, "কাছাকাছি এসেছো, কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয়। সাষ্টাঙ্গ মানে, জানু, পদ, পাণি, বক্ষ, বুদ্ধি, শির, বাক্য এবং দৃষ্টি—এই অষ্টাঙ্গ দিয়ে এক সঙ্গে প্রণাম।"

"উঃ, ভেরি ডিফিকাল্ট। টপ ক্রিকেট খেলোয়াড় ছাড়া কেউ সাষ্টাঙ্গ ব্যবহার করতে পারবে না," বলে বসলো তিলক।

ছোটমামা আবার অঙ্গুচেট্টির ঘটনায় ফিরে এলেন।

সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে অঙ্গুচেট্টি রাজাকে বললেন, "মহারাজ, আপনার হুকুমে ফাঁসিতে যাওয়া, সেও তো আমার মতো অধমের সাতজন্মের সৌভাগ্য! কিন্তু মহারাজ, বিশ্বাস করুন, ভিজে দেওয়ালের ব্যাপারটা আমি কিছুই জানি না। দোষ যদি কিছু

হয়ে থাকে তা ওই রাজমিস্ত্রির। খারাপ দেওয়াল বানিয়ে সে আমার কাছ থেকে কড়ায়-গণ্ডায় মজুরি বুঝে নিয়ে চলে গিয়েছে।"

"যাবে কোথায়? আমার রাজত্বে অন্যায় করে পালিয়ে যাওয়া অত সহজ নয়!" হুঙ্কার ছাড়লেন বোকা রাজা। "ধরে নিয়ে এসো ওই রাজমিস্ত্রিকে।" যদি আসতে না চায়, তাহলে মিস্ত্রির মুণ্ডুটা নিয়ে আসবার হুকুম দিলেন মহারাজা।

রাজমিস্ত্রি অন্য এক বাড়িতে সেদিন কাজ করছিল। রাজার সেপাই আচমকা তাকে কোমরে দড়ি পরিয়ে সরাসরি রাজার সামনে হাজির করলো।

মহারাজ মেঘমন্দ্রস্বরে বললেন, "খুব অন্যায় কাজ করেছো। ভিজে দেওয়াল তৈরি করে লোকের জীবন নষ্ট করার ফল তুমি হাতে-হাতে পাবে। ঐ দেখো ওখানে ফাঁসিকাঠ রেডি রয়েছে।"

রাজমিস্ত্রি বেচারার সমস্ত দেহ ততক্ষণে ঘামে ভিজে উঠেছে। সেও বুঝেছে, বোকা রাজার মাথায় যখন একটা মতলব ঢুকেছে তখন সহজে মুক্তি নেই। পান থেকে চুন খসলেই ফাঁসিতে ঝুলতে হবে তাকে।

রাজমিস্ত্রি এবার করজোড়ে বললো, "মহারাজ, পৃথিবীতে আপনার মতো বিজ্ঞ নরপতি আর একটিও নেই। আপনার হুকুমে ফাঁসিতে ঝোলাও আমার মতো সামান্য রাজমিস্ত্রির পক্ষে পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু..."

এইসব প্রশস্তি শুনে বোকা রাজা খুব খুশি হলেন মনে মনে। তবু হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, "আবার কিন্তু কেন?"

বিনয়ে বিগলিত রাজমিস্ত্রি বললো, "মহারাজ, বিশ্বাস করুন। আমার কোনো দোষ নেই। সমস্ত দোষ ওই কুমোরের। সে আমাকে এমন একটা মাটির কলসি বিক্রি করেছিল যার মুখটা বিরাট; নর্মাল সাইজের দেড়া মুখ, মহারাজ।" এই বলে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো রাজমিস্ত্রি।

রাজমিস্ত্রিকে মুক্তির হুকুম দিয়ে মহারাজ বললেন, "কেঁদো না। ওই কুমোরের দুষ্টুমি আমি এখনই ভাঙছি। আমার রাজত্বে কোনো অন্যায় হতে দেবো না।"

বোকা রাজার হুকুম-মতো কুমোরকে বাজার থেকে পাকড়াও করে আনতে পেয়াদার মাত্র কিছুক্ষণ লাগলো। অপরাধের গুরুত্ব আন্দাজ করে পেয়াদা ইতিমধ্যে কুমোরের হাত দুটো পিছন দিকে বেঁধেছে, চোখে পরিয়ে দিয়েছে ঠুলি, যাতে দোষী সাব্যস্ত হলে ফাঁসিতে লটকাতে বেশিক্ষণ সময় না-লাগে।

মহারাজ এবার কুমোরকেও একটা চান্স দিলেন। সব শুনে কুমোর প্রথমেই সমস্ত অপরাধ মেনে নিলো। তারপর বললো, "মহারাজ, কিন্তু আমার দোষ কী? আমি যখন চাকে ওই কলসি তৈরি করছি সেই সময় পায়ে ঘুঙুর পরে একটি মেয়ে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সেই দিকে তাকাতে গিয়েই এই সর্বনাশ হলো, কলসির মুখ একটু বড় হয়ে গেলো। মহারাজ, দোষ ওই ঘুঙুর-পরা মেয়েটির।"

বোকা রাজা মাথা খাটালেন এবং মৃদু হেসে বললেন, "বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। আমি তো কুমোরের কোনো অপরাধ দেখতে

পাচ্ছি না। ফাঁসি দিতে হলে ওই ঘুঙুর-পরা মেয়েটিকেই ফাঁসিতে চড়াও।"

রাজার পেয়াদা আবার ছুটলো শহরে এবং মেয়েটিকে পাকড়াও করে কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এলো।

রাজা গম্ভীরভাবে অভিযোগ করলেন, "কুমোর যখন কলসি তৈরি করছিল তখন ঘুঙুর পরে ওই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গিয়ে তুমি ঘোরতর অপরাধ করেছো। তোমার ফাঁসির হুকুম দেবার আগে জানতে চাই তোমার কোনো বক্তব্য আছে কিনা।"

মেয়েটি বললো, "মহারাজ, আমার কী দোষ? গলার হার গড়াবার জন্যে আমি স্যাকরাকে কিছু সোনা দিয়েছিলাম। গয়না নেবার দিনে স্যাকরা কথা রাখলো না, তাই তাগাদা দেবার জন্যে আবার স্যাকরার দোকানে যেতে হয়েছিল আমাকে। মহারাজ, আপনার জ্ঞানের এবং বিদ্যার সীমা নেই; আপনি বলুন, দোষ আমার না ওই মিথ্যেবাদী স্যাকরার?"

চোখ বন্ধ করে মহারাজ চিন্তা করলেন। জ্ঞান এবং বিদ্যার প্রশংসা শুনে তিনি বেজায় খুশি। চোখ খুলে মহারাজ বললেন, "মেয়েটিকে সসম্মানে মুক্তি দাও এবং বন্দী করে আনো ওই দুষ্টু স্যাকরাকে।"

ধূর্ত স্যাকরা রাজসভায় এসে বুঝলো তার সামনে ভয়ানক বিপদ। রাজা বললেন, "তোমার কপালেই ফাঁসি রয়েছে। কেন তুমি মেয়েটির গয়না সময়মতো দাও নি? কেন তাকে ঘুরিয়েছ?"

রাজার হুঙ্কারে স্যাকরার চোখে অন্ধকার নেমে এলো। কিন্তু

যথাসাধ্য চেষ্টা করে সে নিজেকে সামলে নিলো। স্যাকরা বুঝলো কথাবার্তা সামান্য এদিক-ওদিক হলেই এই বোকা রাজার ফাঁসিকাঠ থেকে তার মুক্তি নেই।

স্যাকরা এবার তাকিয়ে দেখলো রাজসভায় একজন নাদুস-নুদুস শ্রেষ্ঠী বসে আছেন। শ্রেষ্ঠ ধনাদি যাঁর আয়ত্তে সেই বণিককে সে যুগে শ্রেষ্ঠী বলা হতো। সুযোগ বুঝে স্যাকরা বলে বসলো, "মহারাজ, দোষ ওই শ্রেষ্ঠীর। ওঁর কাছে আমি সোনা চেয়েছি, কিন্তু উনি দেননি, তাই আমাকে খদ্দের ফেরাতে হয়েছে।"

বোকা রাজা তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। স্যাকরা এবার বললো, "তাছাড়া, মহারাজ, আমার এই রোগা চিমড়ে চেহারা আপনার ওই বিরাট ফাঁসি-কাঠের পক্ষে বেমানান, আমি ঝুললে ফাঁসিকাঠেরই অপমান। অথচ শ্রেষ্ঠীর স্বাস্থ্য কী নধর দেখুন।"

রাজা সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, "সত্যি, শ্রেষ্ঠীকেই ওই ফাঁসি-কাঠে মানাবে।"

এবার ছোটমামা একটু থামলেন। বুলবুল, তিলক, শিবাজী তিনজনেই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে উঠলো, "তারপর?"

বুলবুল অভিযোগ করলো, "উঃ মামা! গল্পের এই ডেনজারাস সময়ে কেউ থামে?"

ছোটমামা হেসে বললেন, "থামছি না। কিন্তু ওই মোটা শ্রেষ্ঠীর ফাঁসির ব্যবস্থা করতে একটু সময় লাগবে তো?"

ছোটমামা বললেন: এই সব কাণ্ড যখন চলছে তখন রাজসভার কয়েকজন লোক বোকা রাজার ওপর খুব বিরক্ত হয়ে

উঠেছেন। তাঁরা ফিসফিস করে আলোচনা করছেন, "এমন বোকা রাজার অধীনে দেশ রাখা তো বিপজ্জনক—কোনদিন কোথা থেকে কী সর্বনাশ হবে ঠিক নেই।"

এবার নিজেদের মধ্যে তাঁরা গোপনে আরও কী সব পরামর্শ করলেন।

ফাঁসিকাঠের সামনে তখন বেশ ভিড়। শ্রেষ্ঠীকে ফাঁসিতে ঝোলানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে দু'জন লোক হঠাৎ হৈ-চৈ করে উঠলো। দেখা গেলো, দু'জনের মধ্যে প্রচণ্ড বচসা চলছে।

রাজা দুজনকেই শান্ত হবার হুকুম দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, স্বয়ং রাজার সামনে কেন এমন ঝগড়াঝাটি চলছে?

একজন লোক বললো, "ব্যাপারটা খুব গোপনীয়। কিন্তু মহারাজ, আপনি নিজে যখন জিজ্ঞেস করেছেন তখন কিছুই চেপে রাখবো না। কারণ আপনার মতো বুদ্ধিমান রাজার কাছে কোনো কিছুই চাপা থাকবে না।"

মহারাজ খুব খুশি হয়ে প্রশ্ন করলেন, "ব্যাপারটা কী?"

লোকটা বললো, "মহারাজ, পাঁজিতে আছে, এই দিনে এই সময়ে এই ফাঁসকাঠে যে ঝুলবে সে সোজা স্বর্গে যাবে এবং পরের জন্মে সে-ই রাজা হবে। মহারাজ, কেন মিথ্যে বলবো, রাজা হবার খুব ইচ্ছে আমার। বন্ধুকে ব্যাপারটা যখন বললাম তখন সে আমাকে আটকে দিচ্ছে, কারণ বন্ধুরও রাজা হবার ইচ্ছে হয়েছে। সেই থেকে হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেলো, কে রাজা হবার সুযোগ নেবে তা ঠিক করা যাচ্ছে না।"

রাজা এবার তড়াং করে সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হুঙ্কার ছাড়লেন, "এতো বড় আস্পর্ধা! কোন্ নরাধম এদেশের রাজা হতে চায়? আমি ছাড়া কেউ রাজা হতে পারবে না, সুতরাং আমিই ফাঁসিতে চড়বো—আর কাউকে চান্স দেবো না।" এই বলে বোকা রাজা নিজেই ফাঁসিকাঠে ঝুলে পড়লেন।

"বুঝলে তোমরা?" গল্প শেষ করে ছোটমামা জিজ্ঞেস করলেন।

শিবাজী তবু জিজ্ঞেস করলো, "তারপর?"

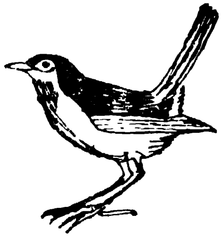
ছোটমামা বললেন, "তারপর আর কী? একজন সত্যিকারের বুদ্ধিমান লোককে দেশের প্রজারা রাজা করে সুখে দিন কাটাতে লাগলো।"

তিলক বললো, "ঠিক হয়েছে। যেমন বোকা রাজা তেমন শাস্তি পেয়েছে।"

বুলবুল কিন্তু একমত হতে পারলো না। বোকা রাজার বেঘোরে মৃত্যু হওয়ায় তার খুব দুঃখ হয়েছে। সে বললো, "আহা রে! আমি ওখানে থাকলে বেচারী রাজামশায়কে বলে দিতাম, খুব সাবধান মহারাজ, লোকগুলো আপনাকে ঠকাবার চেষ্টা করছে।"

শিবাজী ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো, "বুলবুলের সঙ্গে কোনো গপ্পো শোনা যায় না। সব লোকের জন্যে ওর দুঃখু। সবার জন্যে চোখের জল।"

"আহা রে! এমনিই তো এতো দুঃখু রয়েছে। গল্পেও আবার কেন দুঃখ? বোকা রাজা বেঁচে থাকলে কী দোষটা হতো?" বুলবুল কাঁদো-কাঁদো ভাবে বললো।



ছোটমামা আড়চোখে ঘড়িটা দেখে নিলেন। এই তিন দুষ্টু পার্টির মায়েদের ফিরতে এখনও অনেক দেরি আছে। এতোক্ষণে তাঁরা কলেজ স্ট্রীটের কাপড়ের দোকানে পৌঁচেছেন কিনা সন্দেহ।

"আরও একটা গপ্পো শোনাও ছোটমামা, না-হলে তিলক ও শিবাজী ডাইনিং রুমেই টেনিস বল খেলা শুরু করবে।" কয়েক মিনিটের মধ্যেই বুলবুল বলে উঠলো।

"ছোটমামা। প্লীজ। আর একটা স্টোরি," যৌথ রিকোয়েস্ট করলো তিলক ও শিবাজী।

"গপ্পো নয়, উপকথা," বললেন ছোটমামা। "মোটেই বানানো নয় – দেশের গ্রামগঞ্জ থেকে জোগাড় করে আনা ঘটনা।"

বুলবুল বললো, "এবার কিন্তু দুঃখের গপ্পো নয়।"

"নো ফাঁসি বিজনেস, বুলবুল বলতে চাইছে," টিপ্পনি কাটলো তিলক।

"বেশ। মারামারি কাটাকাটির কোনো ব্যাপারই এবার থাকবে না।" প্রতিশ্রুতি দিলেন ছোটমামা। "তবে নতুন গল্প শুরু করবার আগে তোমাদের একটা কোশ্চেন করি। বোকা রাজার বেঘোরে মৃত্যু হয়েছিল কেন?"

"বোকা বলে," শিবাজী চটপট উত্তর দিলো।

ছোটমামা প্রশ্ন করলেন, "পৃথিবীর সব রাজাই তো প্রচণ্ড বুদ্ধিমান ছিলেন না—তাঁরা কী করে রাজত্ব করেছেন?"

শিবাজী এবং বুলবুল চুপ করে রইলো, কিন্তু তিলক বললো, "মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে।"

"ভেরি গুড," বললেন ছোটমামা। "বোকা রাজার বুদ্ধিমান মন্ত্রী থাকলে এতোটা বিপদ হতো না।"

ছোটমামা শুরু করলেন: এবার যে উপকথা শুনবে সেটা জোগাড় করেছিলাম মহারাষ্ট্র থেকে। মারাঠাদের মধ্যে কত হাজার হাজার রূপকথা এবং উপকথা যে ছড়িয়ে আছে তোমাদের কী বলবো! সমস্ত জীবন ধরে কাজ করলেও এইসব সংগ্রহ শেষ হবে না।

বিজাপুরে এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম বীরসেনা। বিচক্ষণ এবং দয়ালু নরপতি হিসেবে তাঁর সুনাম তখন সমস্ত পশ্চিম ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

রাজকার্যে তাঁকে পরামর্শ দেবার জন্যে বীরসেনা চারজন দূরদর্শী মন্ত্রী রেখেছিলেন।

বীরসেনার ভাগ্য খুব ভাল, এই চার মন্ত্রী ছিলেন যেমন সৎ, তেমন কাজের। প্রয়োজন হলে রাজাকে অপ্রিয় উপদেশ দিতেও তাঁরা ভয় পেতেন না।

একবার রাজা বীরসেনার মাথায় খেয়াল চাপলো, শহরের মধ্যে তিনি নিজের জন্যে বিশাল এক প্রাসাদ বানাবেন। এমন প্রাসাদ ভূভারতে যার কোনো জুড়ি থাকবে না। মন্ত্রীদের পরামর্শ

চাইলেন তিনি।

মন্ত্রীরা সব শুনে বললেন, "মহারাজ, উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু এই রাজপ্রাসাদ তৈরির টাকা আসবে কোথা থেকে?"

মহারাজ উত্তর দিলেন, "রাজকোষে যে এতো টাকা নেই তা আমি জানি। সুতরাং সমস্ত প্রজার ওপর নতুন কর বসিয়ে এই প্রাসাদের খরচ তুলতে হবে।"

মন্ত্রীরা সবিনয়ে নিবেদন করলেন, "মহারাজ, প্রজাদের আর্থিক অবস্থা এবছর তেমন ভাল নয়। তাঁদের অনেক অভাব রয়েছে, ঠিক এই সময় আর একটা বিরাট প্রাসাদ তৈরির আর্থিক বোঝা প্রজাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াটা সুবিবেচকের কাজ হবে না। আপনি প্রজাদের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা হারাবেন, মহারাজ।"

এই কথা শুনে মহারাজ খাপ্পা হয়ে উঠলেন। তাঁরই নুন-খাওয়া মন্ত্রীরা যে নতুন রাজপ্রাসাদ তৈরিতে বাধা দিতে পারে তা তিনি ভাবতেই পারছেন না।

বিরক্ত রাজা তৎক্ষণাৎ চার মন্ত্রীকে বরখাস্ত করলেন এবং হুকুম করলেন, "তোমরা এখনই দেশ থেকে নির্বাসিত হও।"

রাজার আদেশ মান্য করে চার বরখাস্ত মন্ত্রী মনের দুঃখে রাজধানী ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁদের মুখ শুকনো এবং পরনে সাধারণ তীর্থযাত্রীর জামাকাপড়।

"এই তো দুঃখ এসে গেলো," ফোঁস করে উঠলো বুলবুল। "তুমি যে বলেছিলে গল্পে এবার কোনো দুঃখ থাকবে না," ছোট-মামাকে সে মনে করিয়ে দিলো।

"চিন্তা করিস না, বুলবুল। প্রথমে দুঃখ থাকলে অনেক সময় শেষে আনন্দ থাকে।" আশ্বাস দিলো তিলক। "ছোটমামা যখন বলেছেন শেষ পর্যন্ত দুঃখ থাকবে না, তখন নিশ্চয় কথা রাখবেন।"

শিবাজী বললো, "ওয়ান কোশ্চেন। ছাঁটাই মন্ত্রীরা ক'মাসের করে মাইনে পেলেন?"

ছোটমামা হেসে ফেললেন। "তখন ওইসব ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা ছিল না—রাজার মর্জির ওপরেই মন্ত্রীদের গদি এবং গর্দান দুই নির্ভর করতো। তাই মনের দুঃখে মুখ বুজে রাজসভা থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া ওই চার বিচক্ষণ বুদ্ধিমান মন্ত্রীর আর কোনো পথই ছিল না।"

রাজধানী থেকে তো বেরিয়ে পড়েছেন। কিন্তু কোথায় যাবেন কিছুই জানা নেই এই চার মন্ত্রীর।

অনেকক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে-হাঁটতে তাঁরা বিরাট এক বটগাছের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মাথার ওপর তখন প্রচণ্ড রোদ্দুর; মন্ত্রীদের সমস্ত শরীর ঘেমে উঠেছে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্যে ওঁরা গাছের তলায় আশ্রয় নিলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরেই তাঁদের ক্লান্তি দূর হলো। এবার তাঁরা চারদিকে তাকাতে লাগলেন। মন্ত্রীরা বুঝলেন, গত রাত্রে এখানে বৃষ্টি হয়েছিল—কেননা মাটি এখনও কাদা-কাদা হয়ে রয়েছে।

চার মন্ত্রী লক্ষ্য করলেন, নরম মাটিতে উটের পায়ের দাগ রয়েছে। চার মন্ত্রীর প্রচণ্ড মেধা। তাঁরা ভাবলেন, রাজকার্যের

ঝামেলা যখন নেই, তখন এই উটের পায়ের ছাপ নিয়ে গবেষণা করা যাক। এতে কিছুটা সময়ও কাটবে।

পায়ের ছাপগুলো ওঁরা যখন মন দিয়ে দেখছেন, তখনই গোলমাল শুরু হলো।

মাথায় পাগড়ি-বাঁধা এক উটওয়ালা হন্তদন্ত হয়ে সেখানে ছুটে এলো। উটওয়ালা হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, "আমার উট হারিয়ে গিয়েছে। আপনারা কি কোনো উটকে এই পথ দিয়ে যেতে দেখেছেন?"

উটওয়ালার অবস্থা দেখে চার মন্ত্রীর মায়া হলো। তা ছাড়া এঁদের নীতিই হলো কোনো মানুষ বিপদে পড়লে তাকে যথাসম্ভব সাহায্য করা।

প্রথম মন্ত্রী উটওয়ালার মুখের দিকে তাকালেন এবং বললেন, "ব্যস্ত হবেন না। নিশ্চয় আপনি উট খুঁজে পাবেন। আচ্ছা, আপনার উটের পিছনের পা কি খোঁড়া?"

উটওয়ালার ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো। সে উত্তর দিলো "ঠিক বলেছেন। আমার খোঁড়া উটকে কি এদিক দিয়ে যেতে দেখেছেন?"

উটওয়ালার দিকে তাকিয়ে দ্বিতীয় মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন "শুধু খোঁড়া নয়, আপনার উটের একটা চোখ কানা।"

উটওয়ালা এবার যেন হাতে চাঁদ পেলো। "ঠিক বলেছেন হুজুর, আমার উটের একটা চোখ নেই। আপনি নিজের চোখেই তা দেখেছেন। এখন দয়া করে বলুন, উট কোথায় গিয়েছে?"

উটওয়ালার কথায় মন্ত্রীরা একটু অস্বস্তিতে পড়লেন। তৃতীয় মন্ত্রী এবার মুখ খুললেন। "দেখুন, আমরা আপনার উটকে দেখি নি। কিন্তু আমরা জানি যে আপনার উটের লেজ নেই।"

উটওয়ালা বললো, "ঠিক বলেছেন হুজুর। গত বছর এক দুর্ঘটনায় আমার উটের লেজ কাটা যায়। এবার দয়া করে বলুন আমার উট কোথায়?"

চার পথচারী কোনোরকম সহযোগিতা করছেন না দেখে এবার উটওয়ালা চটে উঠলো। তার মনে এবার নানা সন্দেহ জাগছে।

বিরক্ত মুখ করে উটওয়ালা বললো, "আর লেজে খেলাবেন না আমাকে। নিজের চোখে না দেখলে আপনারা বললেন কী করে আমার উট কানা, খোঁড়া এবং তার লেজকাটা?"

উটওয়ালার গলার স্বর এবার চড়া। "আপনারাই নিশ্চয় উট চুরি করেছেন। এখনও সময় আছে, যদি গোলমাল পাকাতে না চান তাহলে বলুন কোথায় আমার উট লুকিয়ে রেখেছেন?"

চতুর্থ মন্ত্রী এবার উটওয়ালাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। "দেখুন, আমরা একটুও মিথ্যে বলছি না, আমরা উট দেখি নি। তবে আমরা এও জানি যে আপনার উটের শরীর ভাল যাচ্ছে না।"

এবার উটওয়ালার মনে কোনো সন্দেহ রইলো না যে এরা উট দেখেছে। রেগে-মেগে সে বললো, "তোমরাই যে চোর, তা বোঝাতে আর কোনো প্রমাণ লাগবে না। তোমরা দেখেছো,

আমার উট কানা খোঁড়া লেজকাটা এবং অসুস্থ। ভাল চাও তো আর বাক্যব্যয় না করে আমার উট আমার কাছে নিয়ে এসো। তা-হলে তোমাদের কপালে কষ্ট রয়েছে—রাজার কাছে এই চুরির রিপোর্ট করা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না।"

চার মন্ত্রী উটওয়ালাকে বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। "আপনি শুধু-শুধু আমাদের ওপর সন্দেহ করছেন। আমরা আপনার উটকে দেখি নি এবং আমরা চোর নই। রাজার কাছে আমাদের ধরিয়ে দেওয়ার চেয়ে আপনি উটের খোঁজ করুন। তাতেই আপনার লাভ হবে।"

"চোপরাও।" উটওয়ালা তেড়ে উঠলো। "আর লেকচার দিতে হবে না। তোমরা যে ভদ্রবেশী চোর তা ধরা পড়ে গিয়েছে। যাচ্ছি মহারাজের কাছে; তারপর কোটালের গুঁতোর চোটে তোমরা অপরাধ স্বীকার করবে এবং সুড়সুড় করে বলে দেবে চারাই উট কোথায় লুকিয়ে রেখেছো।"

মাথার পাগড়ি টাইট করে নিয়ে উটওয়ালা এবার ছুটলো রাজদর্শনে। যেতে যেতে সে চিৎকার করতে লাগলো, "চোর হাতে-নাতে ধরা পড়েছে, এখন চোরের শাস্তি চাই।"

মহারাজ বীরসেনা সেদিন বিকেলে তাঁর দেহরক্ষীদের নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন পাগড়ি-পরা একটা লোক হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁর দিকেই ছুটে আসছে।

আভূমি কুর্নিশ করে লোকটি বললো, "মহারাজ, আমি দরিদ্র উটওয়ালা। চারটে দুষ্টু লোক আমার উট চুরি করেছে। এরা

স্বীকার করছে আমার উট খোঁড়া, কানা, লেজকাটা এবং তার শরীর খারাপ। অথচ বোকা সেজে বলছে তারা আমার উটকে দেখে নি। এদের আপনি যোগ্য শাস্তি দিন, চোরের দলকে শূলে না-চড়ালে আপনার রাজ্যে শান্তি থাকবে না, মহারাজ।"

মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় সেই চোরের দল?"

একটু দূরেই একটা বটগাছের তলায় তারা বসে আছে শুনে মহারাজ আর সময় নষ্ট না করে দেহরক্ষীদের নিয়ে সেদিকেই এগিয়ে গেলেন; চুরির ফয়সালা তিনি এখনই করবেন।

দূর থেকে বটগাছের তলায় তাঁর প্রাক্তন চার মন্ত্রীকে বসে থাকতে দেখে মহারাজ বীরসেনা অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর মন্ত্রীরা যে উট চুরি করতে পারেন না এ-সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু রাজার কর্তব্য শুধু সুবিচার করা নয়, এমনভাবে বিচার করা যাতে কারও মনে বিচার সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ না থাকে।

মহারাজকে দেখে চার মন্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নত করলেন। উটওয়ালা গড়গড় করে তার অভিযোগ বলে গেলো। "মহারাজ, এরা এতো মিথ্যেবাদী যে এখনও বলছে আমার উট দেখে নি।"

মহারাজ বললেন, "আপনারা উদ্বিগ্ন হবেন না। কিন্তু চোখে না দেখেও আপনারা কী করে জানলেন উট খোঁড়া?"

প্রথম মন্ত্রী উত্তর দিলেন, "মহারাজ, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে অনেক কিছু বুঝতে পারেন, সবকিছু তাঁদের নিজের চোখে দেখতে হয় না। আমাদের হাতে কোনো

কাজ ছিল না, তাই সময় কাটাবার জন্যে আমরা নরম মাটিতে উটের পায়ের চিহ্ন খুঁটিয়ে দেখছিলাম।"

মহারাজ বীরসেনা নিজেও এবার কৌতূহল বোধ করছেন। তিনি প্রথম মন্ত্রীর মুখের দিকে উৎসুকভাবে তাকিয়ে রইলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কী দেখলেন ?"

প্রথম মন্ত্রী গম্ভীরভাবে বললেন, "নিতান্ত সহজ ব্যাপার, মহারাজ। মাটিতে পায়ের ছাপগুলো থেকেই বোঝা যাচ্ছে উটের পিছনের পা দুর্বল—কোথাও ভাল দাগ পড়ে নি। এই অস্পষ্ট দাগ থেকে সহজেই বলা যায় উট খোঁড়া।"

উটওয়ালা এবার দাগগুলো দেখলো এবং তাকেও স্বীকার করতে হলো মন্ত্রী মিথ্যে কথা বলেন নি।

"পায়ের ছাপে না-হয় পায়ের দোষ ধরা পড়ল। কিন্তু উট যে কানা তা জানলেন কেমন করে ?" উটওয়ালা এবার প্রশ্ন তুললো।

দ্বিতীয় মন্ত্রী বললেন, "শুধু কানা নয়, কোন্ চোখটা কানা তাও বলে দিচ্ছি। মহারাজ আপনি এই জায়গাটা দেখুন। বাঁদিকে বেশি ঘাস থাকা সত্ত্বেও উট কেবল ডানদিকের ঘাস খেয়েছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে এই উট বাঁ চোখে দেখতে পায় না।"

রাজা এবং উটওয়ালা দুজনেই দেখলেন বাঁদিকের সমস্ত ঘাস অক্ষত রয়েছে।

তবুও উটওয়ালার মনের সন্দেহ মিটলো না। "খোঁড়া এবং কানার ব্যাপারটা না-হয় মেনে নিলাম, কিন্তু চোখে না-দেখলে কী

করে এঁরা বললেন, আমার উটের লেজ নেই? মহারাজ, আমি বিচার চাই।”

তৃতীয় মন্ত্রী এবার উত্তর দিলেন, “খুব সহজেই বলে দেওয়া যায় উটের লেজ নেই। মহারাজ, আমি দেখলাম ঘাসের ওপর কয়েক ডজন মশা বসে রয়েছে। রক্ত চুষে-চুষে তারা এত ফুলে উঠেছে যে নড়তে পারছে না। মহারাজ, উটের যদি লেজ থাকতো তাহলে এইভাবে রক্ত খাবার সুযোগ পেতো না মশাগুলো।”

ভিজে ছোলার মতো ফুলে-ওঠা মশাগুলোকে রাজা ও উট-ওয়ালা নিজেদের চোখে দেখে ঠোঁট উল্টোলেন। রাজার চোখে এবার বিস্ময় ফুটে উঠেছে। মন্ত্রীদের সূক্ষ্মদৃষ্টি তাঁকে তাজ্জব করছে।

চতুর্থ মন্ত্রী এবার এগিয়ে এলেন। “মহারাজ, উট যে অসুস্থ তা বোঝাবার জন্যে কোনো ম্যাজিকের প্রয়োজন নেই। উটের যে গোবর পড়ে রয়েছে তা দেখলেই বলা যায় উটের পেট খারাপ হয়েছে।”

উটওয়ালার চোখ দুটো এবার ছানাবড়া! সে বুঝেছে তার ভুল হয়েছিল—এই চারজন নির্দোষ ভদ্রলোককে সে অকারণে সন্দেহ করেছিল।

মহারাজ নিজেও বিস্মিত। তিনি বললেন, “আপনাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং বুদ্ধি আমাকে মুগ্ধ করেছে। আপনারা আমার চোখ খুলে দিয়েছেন, আমি বুঝেছি এই বুদ্ধি না-থাকলে রাজকার্য চালানো

যায় না। আমি আপনাদের ছাড়ছি না, আপনারা আবার আমার মন্ত্রী হোন।"

কোনো কথায় কান না-দিয়ে, প্রায় জোর করে চার মন্ত্রীকে মহারাজ তাঁর রাজধানীতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

"উঃ, বাঁচা গেলো।" এবার হাঁফ ছাড়লো বুলবুল। সৎ-মন্ত্রীরা যে শেষপর্যন্ত বিপদে পড়েন নি তাতে সে খুব খুশি হয়েছে।

তিলক বললো, "এইসব মন্ত্রী, যাকে বলে কিনা এক একখানা জুয়েল! বিলেতে জন্মালে এঁরা প্রত্যেকেই শার্লক হোমস হতে পারতেন।"

"আর আমাদের ইণ্ডিয়াতে জন্মালে?" প্রশ্ন করলেন ছোটমামা।

"ব্যোমকেশ বক্সী কিংবা কিরীটী রায়।" উত্তর দিলো শিবাজী।

ছোটমামা এবার জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রের এই দুই উপকথা থেকে কী বোঝা গেলো?"

তিলক, শিবাজী ও বুলবুল একই সঙ্গে বলে উঠলো: "বোকাদের উচিত সবসময় বুদ্ধিমান লোকদের পরামর্শ নেওয়া।"

সহাস্য ছোটমামা সানন্দে প্রাইজ অ্যানাউনস করলেন, "তোমরা তিনজনেই ফার্স্ট হয়েছো। তিনজনেই একখানা করে চকোলেট পুরস্কার পাবে উইদিন পাঁচ মিনিট।"



প্রাইজ পেয়ে বুলবুল, তিলক ও শিবাজী তিনজনেই খুব খুশী। বিশেষ করে, সবাই ফার্স্ট হয়েছে বলে। তিলক তো স্বীকার করেই বসলো, "আমাদের রাউরকেলায় কখনও একজনের বেশী প্রথম হয় না।"

বুলবুল গলা উঁচু করে শ্লোগান দিলো, "ছোটমামা যুগ যুগ জিও। ভগবান, ছোটমামাকে আমাদের জামশেদপুর গার্লস স্কুলের হেডমিসট্রেস করে দাও।"

শিবাজী বললো, "ছোটমামা ইজ রাইট! কোন্ বইতে লেখা আছে যে একজনের বেশী ফার্স্ট হতে পারবে না?"

খুশ মেজাজে ছোটমামা ঘাড় নাড়লেন। "রাইট! তোমরা সব হীরের টুকরো ছেলেমেয়ে—কোন্ দুঃখে তোমরা ফার্স্ট ছাড়া অন্য কিছু হবে?"

ছোটমামা এইবার আড়চোখে একবার মণিবন্ধে বাঁধা ঘড়িটা দেখে নিলেন। এতোক্ষণে ছোট কাঁটাটা মাত্র একঘণ্টা এগিয়েছে। তিন দিদিকেই জানা আছে—শাড়ির দোকানে ঢুকলে তাঁদের মাথার ঠিক থাকে না। কতক্ষণে শপিং শেষ হবে কিছু ঠিক নেই।

বুলবুল একটু ব্যস্ত হবার লক্ষণ দেখালো। "ছোটমামা, ওরা মার্কেটিং সেরে এখনও ফিরছে না কেন?"

মামা মিটমিট করে হেসে ফেললেন। বললেন, "বাঙালীদের কমন মিসটেক বাজার করাকে মার্কেটিং বলা। ওটা হবে শপিং!"

যিনি নতুন মামীমা হবেন তাঁর ছবিটা মামার টেবিল থেকে শিবাজী এবার তুলে নিয়েছে। একটা কলমের খোঁজ করছে সে, মামীমার ঠোঁটে যে গোঁফটা কিছুক্ষণ আগে এঁকেছিল সেটা আরও একটু বাড়াবার ইচ্ছে হয়েছে।

ছোটমামা দেখলেন অবস্থা সুবিধের নয়। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনবার জন্যে বললেন, "সায়লেণ্ট, সায়লেণ্ট। পিন ড্রপ সায়লেণ্ট। আবার গপ্পো শুরু হতে পারে।"

মামীমার গোঁফের ওপর কাজ না-করে শিবাজী চটপট সোজা হয়ে বসলো। বুলবুল জিজ্ঞেস করলো, "পিন ড্রপ মানে কি ছোটমামা?"

ভারিক্কি চালে তিলক উত্তর দিলো, "এমন শান্ত অবস্থা যে মাটিতে একটা আলপিন পড়লেও তার আওয়াজ শোনা যাবে।"

"গুড।" তারিফ করলেন ছোটমামা। "ওরকম একটা বাংলা কথা বলো তো।"

মাথা চুলকে বুলবুল উত্তর দিলো, "সূচীভেদ্য অন্ধকার।"

"মানে?" জিজ্ঞেস করলেন ছোটমামা।

"এমন ঘন অন্ধকার যে সূচ দিয়ে ফুটো করা যায়," বুলবুল সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলো। জামশেদপুরে ওদের বাংলা চর্চাটা ভালই হয়।

ছোটমামা এবার গপ্পো শুরু করতে যাচ্ছিলেন—কোনো এক দেশে……

কিন্তু ওরা তিনজন এক সঙ্গে দাবী করলো, "এবার কিন্তু রাজার গপ্পো নয়।"

ছোটমামা বোধহয় রাজার গল্পই শোনাতে যাচ্ছিলেন তাই শেষ মুহূর্তে ব্রেক কষলেন। একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "বেশ এবারে একজন সাধারণ লোকের গল্পই শোনাচ্ছি তোমাদের।"

"বিয়ের গপ্পো বলো, মামা।" বিয়েবাড়িতে এসে বিয়ের গল্প শোনবার ইচ্ছে বুলবুলের।

"ঘাবড়াও মাত! এ-গল্পে বর-কনেও আছে—এক ঢিলে দু'পাখি মারা যাবে," ছোটমামা আশ্বাস দিলেন।

"এক ঢিলে আবার দুটো পাখি মারা যায় নাকি?" মামার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করলো শিবাজী।

"নিশ্চয় কেউ এক ঢিলে দু'পাখি মেরেছিল—না হলে বইতে কথাটা এলো কী করে?" শিবাজীকে থামাবার জন্যে তিলক বলে উঠলো। ছোটমামার নতুন গল্পটা শোনবার জন্যে সে ছটফট করছে।

ছোটমামার গল্প আরম্ভ হয়ে গেলো……ব্যাপারটা ঘটেছিল পাঞ্জাবে। পঞ্চ নদীর দেশ পাঞ্জাব জানো তো? ওখানেই অনেক অনেক দিন আগে কোনো এক গ্রামে এক চাষা এবং তার বউ থাকতেন। একদিন চাষার ঘরে সুন্দর একটি ছেলের জন্ম হলো।

অমন চমৎকার ছেলে দেখে গ্রামের সবারই চোখ জুড়িয়ে গেলো।

কিন্তু সেবারে আকাশে মেঘ নেই, মাঠে এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়লো না। চাষবাস সব নষ্ট।

চাষা কিন্তু দমলেন না। পাঞ্জাবীদের এই একটা গুণ—মনে ভীষণ সাহস। দুঃখ কষ্ট বিপদে পাঞ্জাবীরা সহজে ভেঙে পড়ে না।

চাষা বললেন, "চাষ হয় নি বলে আমি ঘরে বসে কান্নাকাটি করবো না। আমি চললাম গ্রাম থেকে শহরে। ওখানে কিছু টাকা রোজগার হয় কিনা দেখি।"

চাষার ভাগ্য ভাল। শহরে গিয়ে জিনিসপত্র কেনা-বেচা করে কিছুদিনের মধ্যে তিনি অনেক পয়সা করে ফেললেন। অন্য লোক হলে হয়তো শহরেই থেকে যেতেন, কিন্তু চাষার মন পড়ে আছে নিজের গ্রামে। তাই তিনি এবার নিজের দেশে ফিরে চললেন।

ছেলের মাকে চাষা বললেন, "দুটো পয়সার মালিক হয়েছি বটে, কিন্তু নিজের জোরে নয় গিন্নী। এ-সমস্তই পয়মন্ত ছেলের কপালগুণে।"

কয়েক বছর পরে চাষার ইচ্ছে হলো ছেলের একটা বিয়ের সম্বন্ধ করেন। বেশ বড় ঘরে ফুটফুটে কোনো মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে হোক।

"ওমা! ছেলের কত বয়েস? এর মধ্যেই বিয়ে!" বুলবুল আর কথা না-বলে থাকতে পারলো না।

"বয়স কম। কিন্তু তখনকার দিনে ওরকমই নিয়ম ছিল। ছোটবেলাতেই বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে থাকতো, তারপর একটু বয়েস হলে বিয়ে হয়ে যেতো।" ছোটমামা ভাগ্নীকে শান্ত করলেন।

"ওইটুকু ছেলের বিয়ে হলো ?" জিজ্ঞেস করলো শিবাজী ?

"হ্যাঁ। পাত্রী পাওয়া গেলো।" ছোটমামা আবার শুরু করলেন। "গ্রাম থেকে অনেক দূরে অন্য এক দেশে ফুটফুটে এক মেয়ের সঙ্গে বিয়ের সমস্ত কথা পাকা হয়ে গেলো। মেয়ের বাবার মস্ত বাড়ি, প্রচুর জমিজমা, মরাইতে অনেক গম, গোয়ালে ডজন ডজন গোরু—ছেলের বাবার সন্তুষ্ট না হওয়ার কোনো কারণই নেই।"

ছোটমামা বললেন, তখনকার যুগে পাকা কথা হলে সঙ্গে-সঙ্গে বিয়ে হতো না। বিয়েটা সময় মতো কয়েক বছর পরে হবে—এই রকমই ঠিক-ঠাক হয়ে থাকতো।

এর কয়েক বছর পরে ছেলে আরও বড় হয়ে উঠেছে। চাষা ভাবছিলেন, এবার বিয়েটা লাগিয়ে বউমাকে নিজের ঘরে নিয়ে আসবেন তিনি। কিন্তু কপালে অত সুখ ছিল না বেচারা চাষার। মনের সাধ পূরণ হবার আগেই কঠিন অসুখে হঠাৎ মৃত্যু হলো তাঁর।

কিছুদিন পরে মেয়ের বাড়ি থেকে খবর এলো, ছেলের যখন বাবা মারা গিয়েছেন তখন সে মেয়ের বাড়িতে এসেই থাকুক। মেয়ের বাবাই সব দায়-দায়িত্ব নেবেন। কিন্তু ছেলের মা রাজী হলেন না।

তিনি বললেন, "আমার ছেলে ডাগর হয়ে উঠেছে, কেন সে ঘর-জামাই হবে ? ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে তাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেবো; বিয়ে করে নতুন বউকে সঙ্গে নিয়ে টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বাবার বাড়িতে ফিরে আসবে, এখানেই ঘরসংসার করবে আর পাঁচজনের মতো।"

মেয়ের বাবা আপত্তি করলেন না। বেয়ান যা বলবেন তাতেই রাজী তিনি।

"নাউ! বেয়ান কাকে বলে ?" গল্প থামিয়ে প্রশ্ন করে বসলেন ছোটমামা।

রাউরকেলার বাসিন্দা তিলক বাংলায় একটু দুর্বল—সে বলতে পারলো না। 'বেয়াড়া' কথাটা সে মার মুখে কয়েকবার শুনেছে —কিন্তু বেয়ান ?

শিবাজীও বাংলায় উইক হতো। কিন্তু তার ঠাকুমা ভিলাইতেই থাকেন। তাই অনেক স্পেশাল বাংলা শব্দ সে শুনেছে। সে এবার তড়াং করে উত্তর দিলো, "জামাইয়ের মা হচ্ছে বেয়ান।"

ছোটমামা মিষ্টি হেসে বুঝিয়ে দিলেন "ছেলের বা মেয়ের শ্বশুর হচ্ছেন বেয়াই এবং ছেলে বা মেয়ের শাশুড়ী হচ্ছেন বেয়ান।"

"তারপর ?" জিজ্ঞেস করলো বুলবুল। গল্পটা কোন্ দিকে এগোবে তা সে এখনও আন্দাজ করতে পারছে না। বুলবুল শুনেছে, বিয়েবাড়িতে নানা গোলমাল হতো সেকালে—শেষ মুহূর্তে হয়তো বিয়ে ভেঙেই গেলো। চাষার ছেলের বিয়েটা ভালয়-ভালয়

না হওয়া পর্যন্ত সে স্বস্তি পাচ্ছে না।

ছোটমামা বুলবুলের উদ্বেগের কারণ বুঝতে পারছেন। মুখের হাসি চেপে রেখে তিনি বলতে লাগলেন: চাষার বউ তো ছেলেকে সাজিয়ে গুজিয়ে ঘোড়ায় চড়িয়ে দিলেন। বললেন, "তুমি বেশ বড় হয়েছো—এবার চলে যাও দূরের সেই দেশে এবং রাঙা টুকটুকে বউমাকে নিয়ে ফিরে এসো যত তাড়াতাড়ি পারো।"

ছেলেও খুব সাহসী। একটুও ভয় পেলো না সে। মাকে প্রণাম করে, টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে সে তেপান্তরের মাঠের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ঘোড়া ছুটছে তো ছুটছে। একটুও ক্লান্তি নেই। সূর্যের আলোয় বরের জামাকাপড় এবং পাগড়ি ঝলমল করে উঠছে—দূর থেকে মনে হচ্ছে ঠিক যেন রূপকথার কোনো রাজপুত্তুর পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে চলেছে রাজকন্যের সন্ধানে।

একটানা চলতে চলতে তেপান্তরের মাঠ কখন শেষ হয়ে গিয়েছে। ঘোড়া ঢুকে পড়েছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে। কিন্তু কোনো দুর্ভাবনা নেই সাহসী কুমারের বুকে—তার ঘোড়া আগের মতোই ছুটতে লাগলো টগবগিয়ে।

কুমার হঠাৎ এবার ঘোড়া থামিয়ে ফেললো। না-থামিয়ে উপায় নেই। পথের ধারেই চলেছে অহি-নকুলের লড়াই।

ছোটমামা বললেন, "অহি-নকুল জানো তো? অহি মানে সাপ এবং নকুল মানে বেজি। এদের সম্পর্ক মোটেই ভাল নয়।

দেখা হলেই লড়াই শুরু হয়ে যায়। তাই বাঙলায় দু'জনের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লেগে থাকলে বলা হয়, এদের মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক।"

বেজি শব্দটা তিলক তখনও বুঝতে পারছিল না। তারপর শিবাজীর কথা শুনে বললো, "ও! বেজি মানে 'মঙ্গুজ'—বলবি তো!"

ছোটমামা গল্প বলে চললেন, কুমার দেখলো সাপ ও বেজির মধ্যে লড়াই চলেছে তো চলেছেই। এই অবস্থায় বেশীর ভাগ লোক পাশ কাটিয়ে পালিয়ে যায়—তারা কোনো হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে চায় না। তাদের কথা হলো, তোমরা যদি নিজেদের মধ্যে মারামারি খেয়োখেয়ি করতে চাও তো করো, আমার কী ?

কিন্তু কুমারের মনে পড়লো বাবার কথা। বাবা বলতেন, যদি কখনও কোথাও দু'জনকে মারামারি করতে দেখো তাহলে ভদ্রলোকের কাজ হলো দু'পক্ষকে ছাড়িয়ে আলাদা করে দেওয়া।

বাবার কথা স্মরণ করে কুমার অনেক চেষ্টায় সাপ আর বেজিকে আলাদা করে দিলো। বললো, "যথেষ্ট হয়েছে, আর যুদ্ধ নয়।"

কুমারের কথায় সাপ শান্ত হয়ে গেলো, কিন্তু বেজি তাকে কোনোরকম পাত্তা দিলো না। সে হঠাৎ আবার সাপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আর কোনো উপায় নেই বুঝে, কোমর থেকে তলোয়ার বার করে বেজিকে কুমার দু'টুকরো করে ফেললো। দোষটা যখন পুরোপুরি বেজিরই তখন তাকে শাস্তি পেতেই হবে।

আর সময় নষ্ট না-করে কুমার আবার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলো। শ্বশুরবাড়ির দেশে ঠিক সময়ে তাকে পৌঁছতে হবেই।

বেশ কিছুটা এগোবার পর কুমার বুঝতে পারলো, বিশাল সাপটা তার পিছনে তাড়া করে আসছে তাকে খাবার জন্যে। ঘোড়া থামিয়ে পিছনে তাকাতেই বিরাট সাপটা প্রায় কুমারের ঘাড়ের ওপর এসে পড়লো।

সাপটা এখনই কুমারকে শেষ করতে চায়—মানুষখাবার লোভে তার দেহটা প্রায় ডবল হয়ে উঠেছে।

কুমার তো অবাক! একটু আগেই যে-সাপটার জীবন সে বাঁচিয়েছে সেই ছুটে আসছে তার সর্বনাশ করতে। কী করে তা হয়? মাথায় কিছুই ঢুকছে না কুমারের।

সাপটা নির্বিকারভাবে বললো, "এতে অবাক হবার কিছু নেই। যস্মিন্ দেশে যদাচার। আমাদের দেশে এই নিয়ম—যদি কেউ উপকার করে তাহলে তার সর্বনাশ করতেই হবে।"

ছোটমামা বললেন, "তিনটে শক্ত শক্ত বাংলা কথা তোমাদের শিখিয়ে দিই। যে উপকারীর উপকার মনে রাখে সে 'কৃতজ্ঞ', যে মনে রাখে না সে 'অকৃতজ্ঞ', আর যে লোক উপকারীর অপকার করে সে 'কৃতঘ্ন'।"

"সাপটা তাহলে কৃতঘ্ন, বুঝেছি," বলে উঠলো বুলবুল। সাপের ব্যাপার-স্যাপার তার মোটেই ভাল লাগছে না।

ছোটমামা বলে চললেন: সাপটা এবার বিশাল হাঁ করে, বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলতে-ফেলতে কুমারকে গিলতে এগিয়ে আসছে।

সর্বনাশ যে আসন্ন তা বুঝতে পারছে কুমার। তবু শেষ মুহূর্তে সাপকে সে অনুরোধ করলো, "আমাকে চারটে দিন সময় দাও। আমার বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে রয়েছে। সেখানে না-গেলে ওরা খুব অসুবিধেয় পড়বে। আমি কথা দিচ্ছি, চার দিনের মাথায় আমি এখানে ফিরে আসবো ; তখন তুমি তোমার কাজ কোরো।"

কথা আদায় করে সাপ তখনকার মতো কুমারকে ছেড়ে দিলো। গভীর অরণ্য ভেদ করে কুমারের ঘোড়া আবার ছুটতে শুরু করলো।

সাপের ব্যাপারে বুলবুলের চিন্তা আরম্ভ হয়েছে। বেচারা কুমারের কথা ভেবে তার চোখে এখনই জল আসছে। সে জিজ্ঞেস করলো, "তারপর কী হলো ছোটমামা ?"

"কী ডেনজারাস অবস্থা বাবা ! আমি কখনও অচেনা লোকের উপকার করছি না," তিলক বলে উঠলো।

ছোটমামা শান্তভাবে বললেন, "খুব জাঁকজমকের মধ্যে কুমারের বিয়ে হয়ে গেলো। সোনার পুতুলের মতো দেখতে বউ —খুব পছন্দ হয়েছে কুমারের।"

সবাই বলতে লাগলো, "আহা কী সুন্দর মানিয়েছে ; যেমন বর তেমন কনে।"

চারটে দিন হৈ-চৈ গান-বাজনা খানাপিনার মধ্যে হুস করে কেটে গেলো। তারপর এলো যাবার সময়। লাল বেনারসী শাড়িতে-মোড়া নতুন বিয়ে-করা বউকে কুমার তুলে নিলো ঘোড়ার

পিঠে। ঘোড়া এবার তীরের বেগে ছুটতে লাগলো।

ছুটতে ছুটতে ঘোড়া যতই বনের কাছে আসতে লাগলো ততই কুমারের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠতে লাগলো। নতুন বউ লক্ষ্য করলো স্বামীর কথাবার্তা হঠাৎ কমে আসছে।

বনের মধ্যে ঘোড়া ঢুকে পড়েছে। বিচ্ছেদের মুহূর্ত আর দেরি নেই। একটু দূরেই যে সেই ভয়ঙ্কর সাপটা অপেক্ষা করছে তা কুমারের ভুলবার কথা নয়।

ব্যাপারটা আর গোপন রাখার মানে হয় না। বিষণ্ণ কণ্ঠে কুমার এবার নতুন বিয়ে-করা বউকে সব কথা খুলে বললো। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেবারও বৃথা চেষ্টা করলো সে। "আমাকে সাপের হাতে ছেড়ে দিয়ে তুমি ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলে যাও। আর তো কোনো উপায় নেই। এ-জন্মে তোমাকে কিছু দিতে পারলাম না। পরের জন্মে যেন তোমাকেই আবার পাই।"

নতুন বউয়ের মনে তখন ভীষণ দুশ্চিন্তা, কিন্তু আচমকা বিপদে ভেঙে পড়বার মেয়ে সে নয়। নতুন বউ বললো, "তোমাকে এখানে একলা ছেড়ে আমি কিছুতেই যাচ্ছি না। আমিও তোমার সঙ্গে সাপের কাছে যাবো।"

দূর থেকে এবার সেই বিপজ্জনক সাপটাকে দেখতে পাওয়া গেলো। কুমারকে গিলে খাবার জন্যে বিশাল বিভীষিকার মতো পথের ধারে সে অপেক্ষা করছে।

গরম নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সাপটা এবার কুমারের দিকে

এগিয়ে আসছে দেখে নতুন বউ আর এক মুহূর্ত দেরি করলো না—স্বামীর সামনে এসে দাঁড়ালো সে।

সাপ একটু বিরক্ত হলো। সামনেই খাবার, এই সময় কে ঝুট-ঝামেলা পছন্দ করে ?

নতুন বউ খুব নরম ভাবে সাপকে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কেন আমার স্বামীর সর্বনাশ করতে চলেছেন ?"

সাপ তখন সেই পুরনো কথা বললো, "তোমার স্বামী আমার উপকার করেছে, উপকারীর সর্বনাশ করাই আমাদের দেশের নিয়ম।"

মাথায় হাত দিয়ে বসলো নতুন বউ। "এরকম অদ্ভুত নিয়মের কথা তো কেউ কখনও শোনে নি! পৃথিবীতে সবাই তো উপকারীর উপকারের চেষ্টা করে।"

সাপ বিরক্ত হয়ে বললো, "তোমার বয়স কম, অভিজ্ঞতা নেই, শুনে রাখো, যস্মিন্ দেশে যদাচার—যে দেশে যে নিয়ম।"

নতুন বউ তখনও নাছোড়বান্দা। সে বললে, "হতেই পারে না। যদি কেউ উপকার করে থাকে, ভুলেও তার ক্ষতি করতে নেই। যাতে তার ভাল হয় তার চেষ্টা করতে হয় সারা জীবন।"

পুরুষমানুষ এই কথা বললে সাপ তখনই বকুনি লাগাতো। কিন্তু নতুন বিয়ে-হওয়া বধূ। মুখ ব্যাজার করে সাপ জিজ্ঞেস করলো, "দূরে পাঁচটা গাছ দেখতে পাচ্ছো ? ওদেরই জিজ্ঞেস করো কেন এ-দেশে এই নিয়ম চালু হলো।"

যদি কোনো পথের হদিশ পাওয়া যায় এই আশায় নতুন বউ

তখনই গাছগুলোর কাছে হাজির হলো। কিন্তু গাছগুলোর কাছে যে ঘটনা শোনা গেলো তা বেশ গোলমেলে।

একটা গাছ গভীর দুঃখ চেপে রেখে বললো, আগে এখানে তিন জোড়া গাছ ছিল। এখন একটা গাছ কমে গিয়েছে। সেই বিরাট গাছটার গুঁড়ির কাছে বড়সড় একটা গর্ত ছিল, যার মধ্যে একজন মানুষ ইচ্ছে করলেই আশ্রয় নিতে পারতো। একদিন এক চোরকে গ্রামের লোকরা তাড়া করছে। প্রাণের ভয়ে চোর পালাচ্ছে। আর ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লোকগুলো ছুটে আসছে।

প্রথম লোকটা তখন গাছের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদ-কাঁদ গলায় আশ্রয় চাইলো। বললো, "তুমি যদি আমাকে লুকিয়ে না রাখো তা হলে পিছনের লোকগুলো আমাকে এখনই খুন করে ফেলবে।"

গাছটার মনে খুব দয়া ছিল। সকলের মঙ্গল করতে চাইতো সে। বিপদ বুঝে সে নিজের গর্তের মধ্যে লোকটাকে ঢুকতে বললো। লোকটা সেখানে আশ্রয় নিতেই নিজের গর্তটা সে এমনভাবে ঢেকে ফেললো যে বাইরে থেকে কার সাধ্য বোঝে ভিতরে কেউ লুকিয়ে আছে।

অনেক চেষ্টা করেও কেউ তাকে খুঁজে পেলো না। লোকটা সমস্ত রাত গাছের গর্তে লুকিয়ে রইলো এবং পরের দিন ভোরে আবার বেরিয়ে পড়লো। ওই গাছ ছিল চন্দনের থেকেও সুগন্ধ। সমস্ত রাত কোটরে থেকে লোকটার দেহ থেকে তখন ভুরভুর করে গন্ধ ছাড়ছে।

লোকটা এবার হাঁটতে হাঁটতে এক গঞ্জে হাজির হয়েছে। সেখানকার একজন লোক বললো, "বাঃ, অদ্ভুত সুগন্ধ বেরুচ্ছে আপনার দেহ থেকে। এমন মাতোয়ারা গন্ধ তো আগে কখনও শুঁকি নি। কী সেণ্ট মেখেছেন?"

লোকটা কোনো উত্তর দিলো না। কিন্তু অন্য লোকটাও ছাড়বার পাত্র নয়। সে সোজা রাজার কাছে গিয়ে হাজির হলো। "মহারাজ, এখানে একটি নতুন লোক এসেছে—তার সঙ্গে অদ্ভুত সেণ্ট রয়েছে। আমাদের কাছে সে কিছু খুলে বলছে না; কিন্তু আপনি হুকুম করলে হয়তো বলতে পারে।"

রাজার সেপাইরা সঙ্গে-সঙ্গে লোকটাকে রাজসভায় ধরে নিয়ে এলো।

রাজা বললেন, "এই সেণ্টের ব্যাপারটা যদি খোলাখুলি বলে দাও তা হলে তোমাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। আর যদি না বলো, তা হলে তোমার গর্দান নেওয়া হবে।"

গর্দান যাবার ভয়ে লোকটা ফাঁস করে দিলো, "মহারাজ, গতকাল রাত্রে একটা গাছের তলায় আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমি কোনো কৃত্রিম গন্ধদ্রব্য মাখি নি, কিন্তু ওই গাছের গন্ধ আমার জামাকাপড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।"

মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে হুকুম করলেন, "আমার লোকজনদের গাছটা দেখিয়ে দাও।"

লোকটা তখন বনের মধ্যে গিয়ে যে-গাছ তাকে আশ্রয় দিয়েছিল সেইটা দেখিয়ে দিলো, আর রাজার লোকজন সঙ্গে সঙ্গে

কুড়ুল দিয়ে সেই গাছটা কেটে ফেললো।

পাঁচটা গাছ এবার গম্ভীর হয়ে নতুন বউকে বললো, "সেই থেকেই এই বনের নিয়মকানুন পাল্টে গেলো। কেউ উপকার করলে তার সর্বনাশ করার আইন চালু হয়েছে।"

নতুন বউ সমস্ত ব্যাপারটা শুনলো, কিন্তু তার মন তখনও সায় দিতে চাইছে না। মুখ কালো করে সে আবার সাপের সামনে এসে দাঁড়ালো।

সাপ বললো, "এবার সন্দেহ মিটেছে তো? এদেশের নিয়ম-কানুন কী তা জানা হলো তো?"

নতুন বউ এখনও স্বামীকে বাঁচাবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কাঁদ-কাঁদ হয়ে সে বললো, "আমি তো আপনার কোনো উপকার করি নি—তবু আপনি কেন আমার সর্বনাশ করতে চলেছেন?"

সাপ বিরক্ত হয়ে বললো, "অতশত ভেবেচিন্তে কাজ করবার মেজাজ আমার নেই। তোমার স্বামী যখন আমার উপকার করেছে তখন তার সর্বনাশ আমাকে করতেই হবে।"

বুলবুল এতোক্ষণ চুপচাপ ছোটমামার গপ্পো শুনে যাচ্ছিল। কিন্তু সে আর নিজের দুঃখ চেপে রাখতে পারলো না। কাঁদ-কাঁদ হয়ে বুলবুল বললো, "ইস্, অমন সুন্দর কুমারকে সাপটা খেয়ে ফেলবে। না, এ সহ্য করা যায় না।"

তিলকও চিন্তিত। গম্ভীরভাবে সে বললো, "আমার ইচ্ছে করছে, মিলিটারিকে বলে দিই—সাপটাকে ফায়ার করে উড়িয়ে দিক।"

শিবাজী বললো, "আজে-বাজে কথা বলে তো লাভ নেই—তখনকার যুগে মিলিটারি কোথায়? কামান, বন্দুক কিছুই তো আবিষ্কার হয় নি।"

ভাগ্নীর করুণ অবস্থা দেখে ছোটমামা এবার বললেন, "বুলবুল, তুমি এখন থেকে কেঁদো না। ধৈর্য ধরে সমস্ত ঘটনাটা শোনো। তারপর যা-হয় কোরো।"

শিবাজী বললো, "ছোটমামার অবস্থাটাও বোঝো। বুলবুলের কান্না থামাবার জন্যে যা ঘটেছিল তা উল্টে-পাল্টে দিতে পারে না। উপকথার ব্যাপারে ছোটমামার কোনো স্বাধীনতাই নেই—যা-যা হয়েছিল তাই মামাকে বলে যেতে হবে।"

ছোটমামা আবার শুরু করলেন :

সেই গভীর বনের মধ্যে সাপটা এবার কুমারকে খাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

নতুন বউ কিন্তু তখনও হাল ছেড়ে দেয় নি। সাপের কাছে এগিয়ে গিয়ে সে বললো, "আমার কথা আপনাকে ভাবতেই হবে। আপনার কোনো উপকার করলাম না, অথচ বিয়ের এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি আমার স্বামীকে খেয়ে ফেলে আমার কপালের সিঁদুর মুছিয়ে, হাতের নোয়া ভাঙিয়ে বিধবার বেশে ফিরিয়ে দিচ্ছেন।"

কুমারকে খাবার জন্যে সাপটা ইতিমধ্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তর্কাতর্কিতে অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে। ঝটপট একটা ব্যবস্থার জন্যে সাপটা এবার নিজের গর্তের মধ্যে ঢুকে গেলো এবং কিছুক্ষণের

মধ্যেই বেরিয়ে এলো।

নতুন বউকে এবার সাপ বললো, "তোমার স্বামীকে আমি এখনই খাবো। তবে তোমাকে এই দুটো বড়ি উপহার দিলাম।"

"এই বড়ি নিয়ে আমি কী করবো?" নতুন বউ কাঁদ-কাঁদ স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

সাপ বললো, "তোমার দুঃখের কথা ভেবেই এই বড়ি দুটো আমি গর্ত থেকে বার করে আনলাম। এই বড়ি খেলে তোমার দুটি রাজপুত্রের মতো ছেলে হবে, তাদের নিয়ে তুমি স্বামীর শোক ভুলে ঘর সংসার করতে পারবে।"

নতুন বউ এবার কান্নায় ভেঙে পড়লো। "চাই না আমি তোমার দেওয়া এই বড়ি। বড়ি খেয়ে আমার না হয় ছেলে হলো। কিন্তু আমার কী হবে? আমার শাশুড়ী আমাকেই দোষ দেবে। বলবে, এই অপয়া ডাইনীটার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পরেই আমার ছেলেটা অপঘাতে মারা গেলো।"

বিরক্ত সাপ আবার গর্তের মধ্যে ঢুকে আর একটা বড়ি নিয়ে এলো। বললো, "তোমার সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছি। এই বড়িটা রাখো। যে তোমার বদনাম করবে এই বড়ির গুঁড়ো তার মাথার ওপর ছড়িয়ে দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।"

নতুন বউ মুহূর্তের মধ্যে পরের ব্যবস্থা ঠিক করে নিলো। যেন কিছুই বোঝে না এমন বোকা-বোকা ভাবে সে জিজ্ঞেস করলো, "কী ভাবে এই বড়ির গুঁড়ো ছড়াতে হবে? এই ভাবে?"

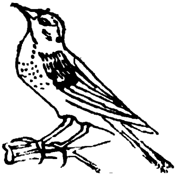
সাপ মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়েছিল, আর সেই সুযোগে বুদ্ধিমতী বউ আচমকা সেই বড়ির গুঁড়ো সাপের মাথায় ছড়িয়ে দিলো। আর দুর্দান্ত সেই সাপটা সঙ্গে-সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো।

তারপর স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে নতুন বউ নিশ্চিন্তে শ্বশুরবাড়ির পথে যাত্রা করলো।

বুলবুল এতোক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। বললো, "উঃ, বাঁচা গেলো। আমি তো গপ্পো শুনতে-শুনতেই ঠাকুরের কাছে মানত করে বসে আছি। ঠাকুর তুমি নতুন বউয়ের সর্বনাশ কোরো না, আমি তোমাকে পুজো দেবো। যাক ঠাকুর আমার কথা শুনেছেন।"

শিবাজী বললো, "যেমন দুষ্টু সাপটা তেমন শাস্তিও হয়েছে। একেই বলে টিট ফর ট্যাট—নিজের প্যাঁচে নিজে পড়ে গিয়েছে।"

তিলক বললো, "কী অদ্ভুত দেশ বাবা! যে-দেশে লোকে উপকারীর সর্বনাশ করতে চায় সে দেশের কখনও ভাল হতে পারে না।"



দুষ্টু সাপের হাত থেকে কুমারের বাঁচার কথা শোনার পরে বুলবুল তখনও হাঁপাচ্ছে।

"উঃ যা সব কাণ্ডকারখানা! আর একটু হলে কী অঘটন ঘটতো!" বুলবুল সবাইকে শুনিয়ে বললো।

তিলক বললো, "দূর বোকা! গল্প ইজ গল্প।"

বুলবুল আপত্তি জানালো। "বললেই হলো! নিশ্চয় এইসব ঘটনা ঘটেছে। না হলে গ্রামের লোকরা এসব কথা এতোদিন ধরে মনে রেখেছে কী করে?"

ছোটমামা ততক্ষণে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। যা লম্বা ফিরিস্তি নিয়ে শিবাজী, তিলক ও বুলবুলের মায়েরা বেরিয়েছেন! এতো তাড়াতাড়ি তাঁরা বাড়ি ফিরছেন না। শাড়ির দোকানে, ব্লাউজের দোকানে, মিষ্টির দোকানে, স্যাকরার দোকানে আজ সর্বত্র ভিড়—কোনো জায়গা থেকে ঝপ করে বেরিয়ে আসা যাবে না। তারপর রয়েছে নেমন্তন্নের চিঠি বিলনোর পালা। প্রত্যেক বাড়িতেই কিছুক্ষণ বসতে হবে। না-হলে আত্মীয়-স্বজনদের রাগ হবে—ঠিক মতো নেমন্তন্ন হয় নি বলে তাঁরা বউভাতের দিন হয়তো আসবেন না।

তিনটে ঝকঝকে ভাগ্নে-ভাগ্নীকেও মামা একবার আড়চোখে দেখে নিলেন। দুষ্টু বলে এদের খুবই বদনাম, কিন্তু এখন তারা তিনজনই গল্পের মন্তরে শান্ত হয়ে আছে! কেউ কোনো জিনিস ভাঙছে না, খাটের ওপর উঠে দাপাদাপি করছে না, হৈ-হুল্লোড় করে দাদুর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে না।

মামা নিজের মনেই বিড়বিড় করলেন, "এক দুই তিন—অর্থাৎ তিন শত্রু।"

"তিন শত্রু মানে কী?" শিবাজী সঙ্গে সঙ্গে ছোটমামাকে জিজ্ঞেস করলো।

"মানে, তিনটে দিয়ে কখনও শেষ করতে নেই—তাহলে শত্রু হয়," বুলবুল শুনিয়ে দিলো। কথাটা সে মায়ের মুখে অনেকবার শুনেছে।

"ছোটমামা, ব্যাপারটা খুবই ডেনজারাস! তিনটে গল্প হয়েছে, তুমি প্লীজ, আর একটা স্টোরি শোনাও," বললো তিলক।

"হিপ-হিপ্-হুররে। লং লিভ ছোটমামা," আরও গল্প শোনার সম্ভাবনায় খুশী হয়ে শ্লোগান শুরু করলো শিবাজী।

ছোটমামা একটু ভেবে নিলেন। বললেন, "বেশ, এবার তোমাদের মধ্যপ্রদেশের একটা গপ্পো শোনাচ্ছি।"

"এবার যেন বনের মধ্যে ওই রকম ভয়ঙ্কর সাপটাপ না থাকে," বুলবুল গোড়াতেই ছোটমামাকে সাবধান করে দিলো।

ছোটমামা মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, "এ গল্পেও সাপ আছে—তবে খুব শান্ত সাপ। কোনো সাতে-পাঁচে থাকে না এমন সাপ!"

"ছোটমামা, একটা মজার গপ্পো চাই," শিবাজী ও তিলক একত্রে আব্দার করলো।

"গপ্পোটা মজারই বলতে পারো। গপ্পোটা আমার নিজের সংগ্রহ নয়। শুনেছিলাম, ভিলাই ইস্পাত কারখানার মিস্টার শুক্লার কাছ থেকে। ভিলাই সম্বন্ধে একটু বলে দাও তো, শিবাজী।"

"মধ্যপ্রদেশে, ডিসট্রিক্ট দুর্গ। মস্তবড় ইস্পাত কারখানা। ওখানে আমার বাবা এবং পিসেমশাই কাজ করেন," চটপট উত্তর দিলো শিবাজী। "বাবা আছেন মাইনিং-এ, আর পিসেমশাই ব্লাস্ট ফারনেসে। লোহা গলানো হয় ওখানে।"

ছোটমামা বললেন, "বিচিত্র এই মধ্যপ্রদেশ — বস্তার, মালব, বুন্দেলখণ্ড, ছত্রিশগড়ের গ্রাম গ্রামান্তরের হাজার হাজার কথা-কাহিনী আর কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে। বড়ো হয়ে তোমরা মধ্যপ্রদেশ সম্বন্ধে পড়াশোনা কোরো।"

বুলবুল, তিলক ও শিবাজী খুব মন দিয়ে ছোটমামার কথা শুনছে। মামাও ক্রমশঃ গল্পের মধ্যে ডুবে গেলেন।

ছোটমামা বললেন, "তোমাদের নতুন মামীমা চিত্রলেখা, কিছুদিন বস্তারে গল্প সংগ্রহ করে এসেছে। ওর কাছে তোমরা অনেক গল্প শুনবে।"

এ-গল্পটা অনেকদিন আগের। তখন এদেশে বিজলীবাতি, রেডিও, টেলিভিশন, গ্রামোফোন, রেকর্ড কিছুই আসে নি। লোকে তখন নিজেরাই গান গাইতো। মাঝি নৌকা বাইবার সময়, বেয়ারা পাল্কি বইবার সময়, চাষী ধান কাটার সময়, ঘরের

বউ ধান ভানবার সময় আপন মনে সুর ধরে গাইতো। এইভাবে গান গাইলে কাজটাও ভাল হতো, আর শারীরিক পরিশ্রমের কষ্টও কমে যেতো।

এক গ্রামে এক বোকা বউ থাকতো। একটু রাগী প্রকৃতির মানুষ এই বউটি। স্বামীকে কথায়-কথায় সে মুখ-ঝামটা দিতো।

এই গ্রামে আরও অনেক বাড়ি ছিল এবং সেই সব বাড়ির বউরা ধান ভানার সময় সুর করে চমৎকার গান গাইতো। এ-বাড়ির বউ নিজের বাড়িতে বসে-বসে এই গান শুনতো আর রাগে ফুলে-ফুলে উঠতো।

রাগের কারণ আর কিছু নয়, বউয়ের গলায় গান আসে না। ঢেঁকিতে পা রেখে বউ কতবার গাইবার চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনো ফল হয় নি।

শেষে বউ একদিন প্রতিবেশী অন্য বউদের জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা অমন সুন্দর সুন্দর গান গাও কী করে?"

পাড়ার বউরা জানতো এই বউ বোকা। তারা মজা করে বললো, "কোথায় আর পাবো? আমাদের স্বামীরা দাম দিয়ে কিনে আনে।"

রসিকতাটা বোকা বউয়ের মাথায় ঢুকলো না, সে ভেবে নিলো, গানও নিশ্চয় হাটে বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

বোকা বউ এবার সোজা স্বামীর কাছে হাজির হলো। অভিমানে মুখ ভার করে বললো, "আমি কিছু শুনতে চাই না। এখনই গঞ্জ থেকে আমার জন্যে খুব ভাল গান কিনে নিয়ে এসো।"

চাষী জানে বদমেজাজী এই বউয়ের সঙ্গে তর্ক করে কোনো কোনো লাভ নেই। গান যে কিনতে পাওয়া যায় না একথা কিছুতেই বউয়ের মাথায় ঢুকবে না।

অগত্যা চাষী বললো, "ভাল গানের বোধ হয় দাম অনেক। শুধু শুধু টাকা নষ্ট করাটা কী ঠিক হবে?"

"হোক্‌গে দাম, আমি খুব ভাল গান চাই। টাকা নিয়ে কি আমি স্বর্গে যাবো!" মুখ ঝামটা দিলো বউ।

"তাহলে পাঁচটা টাকা দাও। আমি বাজারে বেরোই," এই বলে চাষী বিরাট একটা পাগড়ি মাথায় জড়িয়ে নিলো। এখানকার কেউ খালি মাথায় শহরে যায় না, তাতে মান সম্মান থাকে না।

বোকা বউ ঝট করে মাটির জালার মধ্যে লুকনো পাঁচটা টাকা বার করে দিলো। ভালো গান তার চাই-ই চাই। বেসুরো গানের জন্যে পড়শিদের অবজ্ঞা সে আর কিছুতেই সহ্য করবে না।

বাড়ির কর্তা পাগড়ি মাথায় গ্রাম থেকে বেরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে হেঁটে গঞ্জে এসে হাজির হলো। সেখানে একটা দোকানে ঢুকে সে বললো, "খুব ভাল একখানা গান কিনতে চাই আমার পরিবারের জন্যে।"

"পরিবার মানে তো ফ্যামিলি," তিলক বলে উঠলো।

"নিজের বউকেও অনেকে পরিবার বলে," ছোটমামা বুঝিয়ে দিলেন।

গান কিনতে এসেছে! চাষার কথা শুনে দোকানি তো মনে-

মনে হেসে বাঁচে না। কিন্তু খদ্দেরের মুখের ওপর সে কোনো অভব্যতা করলো না। বললো, "ফুরিয়ে গিয়েছে—অন্য দোকানে দেখুন।"

গাঁয়ের কর্তাকে বাধ্য হয়ে আরও হেঁটে অন্য এক দোকানে যেতে হলো। সেখানকার দোকানদারও ইচ্ছে করে লোকটার ভোগান্তি বাড়াবার জন্যে বললো, "আরও এগিয়ে অন্য দোকানে খোঁজ করুন।"

এই করে এক দোকান থেকে আর এক দোকানে ঘুরছে কর্তা, আর দোকানিরা প্রাণভরে হাসছে। ভাবছে যেমন বোকা বউ তেমন বোকা স্বামী। এমন বড় একটা দেখা যায় না। অত শখ করে গাঁটের কড়ি খরচ করে যখন বউয়ের জন্য গান কিনতে বেরিয়েছো, তখন একটু ভোগো!

এইভাবে দোকানে দোকানে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে কর্তা সামান্য বিশ্রামের জন্য এক জায়গায় একটু বসে পড়লো। হঠাৎ তার কানে আওয়াজ গেলো—খড় খড়।

কর্তা দেখলো, একটা মেঠো ইঁদুর মাটিতে গর্ত খুঁড়ছে। কর্তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেলো। মাটিতে কান দিয়ে, ইঁদুরের গর্ত তৈরি করা থেকে তার মাথায় চমৎকার একটা গানের প্রথম লাইন গুন গুন করে উঠলো:

খোঁড়ে খড়র খড়র।

কর্তা এবার লাইনটা মনে রাখবার জন্যে বার বার সাধতে লাগলো—"খোঁড়ে খড়র খড়র।"

ওখান থেকে উঠে আরও কিছুটা পথ হাঁটার পর কর্তা একটা সাপকে সর সর করে সরে যেতে দেখলো। সাপের এই আওয়াজ কানে পৌছতেই তাঁর মাথায় গানের দ্বিতীয় লাইনটা হুম করে এসে গেলো :

সরে সড়র সড়র।

এবার কর্তা দুটো লাইন একসঙ্গে গুন গুন করে গাইতে লাগলো :

খোঁড়ে খড়র খড়র
সরে সড়র সড়র।

বিনা পয়সায় দু'লাইন গান সংগ্রহ হয়েছে ভেবে গাঁয়ের কর্তার মনে খুশির হাওয়া বইছে।

আরও একটু পথ এগোবার পরে ছোট ঝোপের মধ্যে কর্তা একটা খরগোশ দেখতে পেলো। খরগোশটাকে পাকড়াও করবার জন্যে কর্তা এমন একটা ফাঁদ পেতে ফেললো যে, খরগোশটা ঝোপ থেকে পালাবার পথ খুঁজে পায় না।

খরগোশের এই অবস্থা দেখে গাঁয়ের কর্তার মাথায় গানের তৃতীয় লাইন গুন গুন করে উঠলো :

দেখে টগর মগর।

যেমনি এই লাইনটা সুর করে গেয়েছে কর্তা, অমনি খরগোশটা ছুটে পালালো।

কর্তা তখন গানের তিনটি লাইন ভাঁজতে ভাঁজতে আরও একটু এগিয়ে চললেন। এবং একটু দূরেই কয়েকটা হরিণকে

এদিকে-ওদিকে ঝাঁপাঝাঁপি করতে দেখলেন। হরিণের এই দৃশ্য দেখেই চতুর্থ লাইনটা ঝপাং করে কর্তার মাথায় এসে গেলো :

ঝাঁপায় আলং ফালং

গাঁয়ের কর্তার ফুর্তি এখন আর ধরে না। একটি আধলা খরচ না করে পুরো একখানা গান জোগাড় হয়েছে। মনের সুখে সে গাইতে লাগলো :

খোঁড়ে খড়র খড়র
সরে সড়র সড়র
দেখে টগর মগর
ঝাঁপায় আলং ফালং।

এই গান গাইতে-গাইতে কর্তা যখন বাড়ি ফিরে এলো তখন ভর সন্ধ্যা। বোকা বউ সেই কখন থেকে স্বামীর প্রতীক্ষায় দরজার কাছে বসেছিল।

স্বামীকে দেখে বউ আর ধৈর্য ধরতে পারলো না। চিৎকার করে উঠলো, "আমার গান কই?"

কর্তা ভারিক্কি চালে উত্তর দিলো, "একটু অপেক্ষা করো।"

বোকা বউ বললো, "না আমি এক মিনিট অপেক্ষা করতে পারছি না। আমার গান কই?"

কর্তা এবার গম্ভীরভাবে বউকে বললো, "গানটা এতোই ভাল যে দাম বেশী পড়ে গেলো। পাঁচ টাকার একটি পয়সা কমে দিলো না। যা টাকা তুমি দিয়েছিলে সব খরচ হয়ে গেলো।"

বউয়ের মনেও খুব আনন্দ। বললো, "ভাল জিনিস কিনতে

হলে একটু খরচ বেশী পড়বেই তো।”

কর্তা এবার কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বউকে বললো, “এবার গানটা নিয়ে নাও। এতো দামী গানটা যেন আবার ভুলে বোসো না।”

গিন্নীর আনন্দ তো ধরে না। কর্তার কাছ থেকে কয়েকবারেই সে গানটা রপ্ত করে নিলো। ভোর হোক, তারপরে ধানভানার সময় পাড়ার অন্য সমস্ত বউদের তাক লাগিয়ে দেওয়া যাবে।

বোকা বউয়ের মনে এতো আনন্দ হয়েছে যে সময় আর কাটতে চাইছে না। তখন তো আর ঘড়ি ছিল না। দুপুর রাতের একটু পরেই বোকা বউ ভাবলো ভোর হয়ে এসেছে। সে এবার জাঁতায় গম ভাঙতে শুরু করলো।

এমনই কপাল, সেই রাত্তিরে কয়েকটা চোর এসেছে বাড়িতে চুরি করতে। মাটির দেওয়ালে সিঁদ কেটে তারা যেমন গর্ত করেছে ঠিক সেই সময় বোকা বউ গানের প্রথম কলিটা গাইতে শুরু করলো :

থোঁড়ে খড়র খড়র।

চোররা ভাবলো বউ এমনই বোধ হয় কোনো গান ধরেছে। কিন্তু যেমনি তারা খুব সাবধানে গর্তের মধ্য দিয়ে ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করছে, অমনি দ্বিতীয় লাইনটা তাদের কানে গেলো :

সরে সড়র সড়র।

একেবারে অন্ধকার রাত্রি। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু চোররা বুঝতে পারছে না, বাড়ির বউ সত্যিই তাদের দেখে ফেলেছে

কিনা। তারা খুব সাবধানে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। ঠিক সেই সময় গানের তৃতীয় লাইনটা বউ গেয়ে উঠলো ;

দেখে টগর মগর।

বাড়ির বউয়ের নজরে যে তারা পড়ে গিয়েছে সে সম্বন্ধে সিঁদেল চোরদের মনে এবার কোনো সন্দেহ রইলো না। চুরি তো দূরের কথা, এখন পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতেই তারা তৎপর হয়ে উঠলো। ধরা পড়বার ভয়ে তারা পাঁচিলে উঠে ঝাঁপ দিলো। ঠিক সেই সময় বোকা বউ মনের আনন্দে গেয়ে উঠলো :

ঝাঁপায় আলং ফালং।

গান নিয়ে বোকা বউ এমন ডুবে ছিল যে চোরদের ব্যাপারটা তার নজরেই আসে নি।

কর্তা বিছানা থেকে উঠে দেখলো, আজ অন্য দিনের তুলনায় অনেক আগে গিন্নীর জাঁতা ভাঙা, ধান কোটা শেষ হয়ে গিয়েছে।

এমন সময় সিঁদ-কাটা দেওয়ালের দিকে কর্তার নজর পড়ে গেলো। সর্বনাশ! চোর ঢুকেছিল। নিশ্চয় সর্বস্ব নিয়ে পালিয়েছে তারা। কর্তা এবার আর্তনাদ করে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে কর্তা-গিন্নী দুজনে মিলে ঘরদোর তন্ন তন্ন করে দেখলো। চোর ঢুকেছিল কিন্তু জিনিসপত্তর কিছুই নেয় নি।

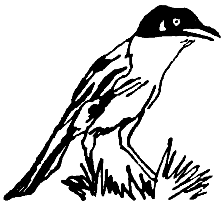
সিঁদ কেটে চোর ঢুকলো অথচ কিছুই নিলো না, এমন তো বড় একটা হয় না। চিন্তিত কর্তা এইবার বোকা বউকে জিজ্ঞেস করলো, "গভীর রাতে তুমি কী করছিলে ?"

ঠিকমতো সময় বুঝতে না পেরে মাঝরাতে উঠে পড়েছিলাম।

আমি তখন থেকেই তোমার কিনে আনা নতুন গানটা প্রাণ খুলে অভ্যেস করছিলাম। অত দামী গান, পুরো ব্যবহার না-করলে চলবে কেন?"

ব্যাপারটা এবার কর্তার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে কর্তা বললেন, "গিন্নি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো? তোমার গান এতই কড়া হয়েছে যে চোরের সাধ্য হয় নি চুরি করার।"

বোকা বউয়েরও আনন্দ ধরে না। স্বামীর ওপর সন্তুষ্ট হয়ে সে বললো, "সত্যি খুব সুন্দর পছন্দ তোমার। বাজারের সেরা গানটাই আমার জন্যে তুমি কিনে এনেছো।"



দুই ভাই ও এক বোন এবার মনের আনন্দে কোরাস শুরু করেছে:

খোঁড়ে খড়র খড়র
সরে সড়র সড়র
দেখে টগর মগর
ঝাঁপায় আলং ফালং।

শিবাজী সেই সঙ্গে টেবিলে তবলা বাজাচ্ছে আপন মনে। ছোটমামাও ভাগ্নে-ভাগ্নীদের কাণ্ড দেখে মজা পাচ্ছেন।

তিলক বললো, "বোকা বউয়ের গানটা মন্দ নয়, মামা। ভাল করে সুর দিয়ে গাইলে হিট গ্রামোফোন রেকর্ড হয়ে যাবে।"

"খারাপ কেন হবে? গাছপালা, নদনদী, পশুপাখী দেখেই তো আদিম যুগের মানুষ নাচ গানের আইডিয়া পেতো," ছোটমামা ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে কথাটা বললেন।

বুলবুল এখন খুব খুশী। সে বললো, "গপ্পোটা আমার খুব ভাল লেগেছে ছোটমামা। কোনো খুনোখুনী নেই, কারও ফাঁসি হয় নি, কাউকে জন্তু জানোয়াররা খেয়ে নেয় নি, কোনো রাজকন্যাকে বনবাসে পাঠানো হয় নি। চোরগুলো পর্যন্ত কী মিষ্টি! কী মিষ্টি! পাঁচিল থেকে লাফ দিতে গিয়ে যে ঠ্যাং ভাঙে নি এই যথেষ্ট।"

ছোটমামা আবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। কখন যে এদের মায়েরা ফিরবে। কিন্তু দোকানপাট বন্ধ হতে এখনও দেড় ঘণ্টা। এবং বিয়েবাড়ির বাজার করতে গেলে মেয়েদের এমন নেশা চেপে যায় যে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ না-হওয়া পর্যন্ত তারা বেরুতে চায় না।

এদিকে গল্পের নেশা ধরে গিয়েছে ছেলেমেয়েদের। শিবাজী বললো, "ছোটমামা, প্লীজ, আর একটা গপ্পো শোনাও। সত্যি গল্প হওয়া চাই কিন্তু।"

ছোটমামা বললেন, "আমরা যেসব গপ্পো সংগ্রহ করি সব সত্যি। বিশ্বাস না হলে গ্রামের লোকদের জিজ্ঞেস করোগে যাও। গ্রামের লোকরা বলবে, সত্যি ঘটনা না-হলে আমার ঠাকুর্দা এ-ঘটনা মনেই রাখতেন না। ঠাকুর্দা আবার ব্যাপারটা শুনেছিলেন তাঁর ঠাকুর্দার কাছে। তখন তো কোনো জিনিসে ভেজাল দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না—গল্পও ছিল সেণ্ট পার্সেণ্ট খাঁটি সত্যি।"

ছোটমামার কথা মন দিয়ে শুনছে শিবাজী, তিলক ও বুলবুল বুলবুল রিকোয়েস্ট করলো, "এবারেও কিন্তু মজার গপ্পো হওয়া চাই, ছোটমামা। দুঃখু তো সব সময়েই আছে—গল্পের মধ্যেও দুঃখু ডেকে এনে কী লাভ বলো?"

ছোটমামা কিছুতেই বুলবুলের কথা ফেলতে পারেন না হেসে বললেন, "বেশ, তাহলে এবার একটা মধ্যপ্রদেশী উপকথ শোনো। ছত্রিশগড়ে কাজ করতে গিয়ে সেবার তোমাদের নতু মামীমা এক গ্রাম থেকে ঘটনাটা সংগ্রহ করেছিল। আমি চিত্রলেখার মুখেই গল্পটা শুনেছি।"

দুই ভাগ্নে ও এক ভাগ্নী অধীর কৌতূহলে মামার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। গল্পের নেশায় তারা ক্ষিদে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে।

মামা বললেন, "বুলবুল যা চাইছে তাই হবে। এই গল্পে কেউ কোনো কষ্ট পাবে না—একটাও খুনখারাপী থাকবে না। চুরি একটা আছে—তবে সেটাও খুব মজার চুরি। চোর ধরা পড়েও ধরা পড়বে না। এমন মজা আজকালকার সিনেমা, নাটকে, উপন্যাসে কোথাও পাওয়া যায় না, এইটা তোমাদের নতুন মামীমার অভিমত।"

মামা আবার শুরু করলেন :

অ-নে-ক দিন আগে এক গ্রামে বিরাট ধনী এক ব্যবসাদার ছিলেন। খুব সুখের সংসার এই বিজনেসম্যানের। চারটি ছেলে এই ভদ্রলোকের—চারজনেই খুব বুদ্ধিমান।

ছেলেরা সাবালক হতেই ব্যবসাদার অনেক ভেবে চিন্তে এক মতলব আঁটলেন।

"সাবালক কী জিনিস মামা?" বুলবুল সরল মনে জিজ্ঞেস করলো।

"ভাল বাংলায় যাকে বলে কিনা প্রাপ্তবয়স্ক। যখন কেউ ছোট থাকে তখন আমরা বলি নাবালক। আমাদের দেশে আঠারো বছর হলেই সাবালক। তখন সে নিজেই অভিভাবকের তদারকী ছাড়াই ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে।"

"আমরা তা হলে নাবালক?" শিবাজী জিজ্ঞেস করলো। আমাদের উচিত অভিভাবকদের কথা শুনে চলা।"

"ইয়েস," উত্তর দিলেন ছোটমামা। "তবে বুলবুলের ক্ষেত্রে কথাটা হবে 'নাবালিকা'।"

"অ্যাঁ! না-বালিকা—তার মানে আমি বালিকা নই!" প্রতিবাদ করে উঠলো বুলবুল।

"অবশ্যই তুমি বালিকা," ছোটমামা হেসে ফেললেন। "মূল কথাটা ফার্সী: নাবালিগ্। এর সঙ্গে বালক-বালিকার কোনো সম্পর্ক নেই!"

ছোটমামা আবার শুরু করলেন—যা বলছিলাম। গ্রামে সেই ব্যবসাদার, ছেলেরা সাবালক হওয়া মাত্রই তাদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দিলেন। বড় ছেলেকে দিলেন তাঁর তেজারতী কারবার।

"তেজারতী কী জিনিস মামা?" শিবাজী এই অদ্ভুত শব্দটা আগে কখনও শোনে নি।

মামা হেসে উত্তর দিলেন, "তোমরা যদি কিছুদিন গ্রামে থাকতে তা হলে এই প্রশ্ন করতে না। গ্রামের অশিক্ষিত লোকরাও জানে তেজারতী মানে সুদে টাকা খাটানোর ব্যবসা। গ্রামের লোকদের বিপদ-আপদ লেগেই আছে, তখন গয়নাগাটি, বিষয়-সম্পত্তি জমা রেখে টাকা ধার করতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধার শোধ না হলে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়।"

"সেকালের ব্যাঙ্কার? তাই না মামা?" শিবাজী জিজ্ঞেস করলো। ওর জানবার কথা, কারণ বড়কাকা ব্যাঙ্কে চাকরি করেন।

"ঠিক বলেছো," উত্তর দিলেন ছোটমামা। "বুড়ো ব্যবসাদার বড় ছেলেকে এই ব্যাংকিং ব্যবসাটি দিয়ে দিলেন। মেজ ছেলেকে দিলেন বিরাট ধান, চাল, ডাল, তেলের আড়ত। সেজকে বললেন, তুমি আমার কাপড়ের আড়তটা নাও। আর ছোট ছেলে পেলো বাবার সমস্ত চাষের জমিজমা। অনেকদিন ধরে খুব দেখাশোনা করে মোটা দাম দিয়ে ব্যবসাদার এ-অঞ্চলের সেরা চাষের জমিগুলো কিনেছেন।

চার ছেলেই খুব কাজের। বাবার বিষয়-সম্পত্তি পেয়ে অনেকে কুঁড়ে হয়ে যায়। কিন্তু বৃদ্ধ ব্যবসাদার দেখলেন, ছেলেরা দায়িত্ব পেয়ে আগের থেকে অনেক বেশি পরিশ্রম করছে এবং নিজেদের চেষ্টায় ব্যবসা এবং চাষের খুব উন্নতি করছে।

বুড়োর বয়স আরও বাড়ছে। শরীরও তেমন ভাল নয়। একদিন চার ছেলেকে তিনি নিজের ঘরে ডাকলেন। বললেন, "মনে হচ্ছে, ওপার থেকে আমার ডাক আসতে দেরি নেই। আমার খুব ইচ্ছে তোমরা চার ভাই মিলেমিশে থাকো—এতে তোমাদেরই লাভ হবে। নিজেদের মধ্যে কিছুতেই সম্প্রীতি নষ্ট কোরো না। আর আমার মৃত্যুর পর এই চারপায়া সরিয়ে তোমরা একসঙ্গে খোঁজাখুজি কোরো—চারটে অমূল্য পাথর এখানে লুকনো আছে—তোমরা চারজনে এক-একটা করে নিও।"

বাবার মৃত্যুর পরে চার ভাই একদিন ঘরের চারপায়া সরিয়ে দামী পাথরের খোঁজ আরম্ভ করলো। ঝটপট তিনটে বহুমূল্য

পাথর উদ্ধার হলো ; কিন্তু চতুর্থ পাথরের খোঁজ নেই। অনেকক্ষণ ধরে খোঁড়াখুঁড়ি হলো—কোনো ফল হলো না।

চার ভাই তখন বললো, "বেশ কঠিন অবস্থায় পড়া গেলো। আমরা চারজন ছাড়া কেউ এই পাথরের খবর জানতো না। কিন্তু পাথর চুরির সন্দেহে আমরা নিজেদের মধ্যে ভাল সম্পর্ক নষ্ট করতে চাই না। বাবা তাহলে স্বর্গে গিয়েও সুখী হবেন না।"

চার ভায়ের মধ্যে এ-বিষয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হলো এবং শেষে তারা সবাই মিলে ঠিক করলো এমন জটীল সমস্যা সমাধানের জন্যে রাজার দ্বারস্থ হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সুবিচারের জন্য সেদেশের রাজার তখন খুব সুনাম।

রাজার প্রাসাদ গ্রাম থেকে বহুদূরে—তবু চার ভাই অনেক কষ্ট স্বীকার করে কয়েকদিন ধরে হাঁটতে-হাঁটতে অবশেষে রাজ-সভায় হাজির হলো। রাজা তখন সিংহাসনে বসে একমনে বিচার করে যাচ্ছিলেন।

চার ভাই যথাসময়ে রাজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো এবং রাজাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো। রাজা মুখ তুলে তাকাতেই তারা একটি হিন্দি ছড়া সুর করে গাইতে লাগলো :

মাল পায়ে আপনো চোর না জানিও যায়ে
প্রীত-রীত দিন দিন বাঢ়ে, কি যে সোই উপায়ে।

মহারাজ, আপনার বিচারখ্যাতি সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা চুরি হয়ে যাওয়া মানিক ফেরত চাই, কিন্তু চোরের নাম কোনোক্রমেই জানতে চাই না। মহারাজ এমন একটা ব্যবস্থা

করুন যাতে আমাদের চার ভায়ের সম্পর্ক দিন দিন আরও ভাল হয়।

রাজা একটু অবাক হলেন। চোরাই মাল ফেরত চায় অথচ চোরের নাম জানতে চায় না এমন কেস তিনি কখনও করেন নি। মৃদু হেসে রাজা বললেন, "আপনারা পথশ্রান্ত। এখন রাজ-অতিথিশালায় গিয়ে বিশ্রাম করুন। আগামীকাল আপনাদের মামলার বিচার করবো।"

খোদ রাজ-অতিথিশালা। সেখানে আদর-আপ্যায়নের এলাহি আয়োজন। রাজার নিজস্ব প্রতিনিধি ঘণ্টায় ঘণ্টায় এই চারজনের দেখা-শোনা করছেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও প্রচুর।

কিন্তু গালিচায় বসে রূপোর থালা থেকে খেতে-খেতে বড়ভাই বললো, "রাজার অতিথি আমরা, বলাটা হয়তো ঠিক নয়, কিন্তু এই যে পিঠে খাচ্ছি তার ময়দায় রক্ত মিশেল হয়েছে!"

মেজভাই বললো, "কথাটা যখন উঠেছে তখন বলতেই হচ্ছে, পচা ঘি-তে পিঠে ভাজা হয়েছে।"

সেজভাই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, "পিঠের দুধটাও খাঁটি নয়! এর মধ্যে মাতৃস্তনের দুধও রয়েছে।"

"রূপোর থালার ওপরে যে কলাপাতা বিছানো হয়েছে তাতে গোবরের গন্ধ!" ছোটভাই এবার নাক কুঁচকিয়ে অন্য ভাইদের বললো।

রাজার একজন গুপ্তচর এই সব কথা শুনছিল। সে যথাসময়ে রাজার কানে চার ভায়ের কথা তুলে দিলো।

মহারাজা তো ভীষণ চটিতং। খোদ রাজ-অতিথিশালার খাবারের সমালোচনা। তিনি চার ভাই এবং খাস ভাণ্ডারিকে ডেকে পাঠালেন। আজ তিনি এই ঔদ্ধত্যের যোগ্য শাস্তি দেবেন, তবে তার আগে ব্যাপারটা তিনি নিজে একটু বুঝে নিতে চান।

চার ভাইকে সামনে দাঁড় করিয়ে রাজা গম্ভীরভাবে জানতে চাইলেন, "রাজ-অতিথিশালার খাবার-দাবার সম্বন্ধে আপনারা যেসব মন্তব্য করেছেন তা কি ঠিক?"

বড়ভাই বুঝলো রাজা বেশ চটে উঠেছেন, ভালভাবে প্রমাণ না দিতে পারলে প্রাণ বিপন্ন হতে পারে। একটু ভেবে নিয়ে বড় ভাই বললো, "মহারাজ, আপনি যখন এ-বিষয়ে জানতে আগ্রহী হয়েছেন তখন ব্যাপারটা সম্বন্ধে ভালভাবে তদন্ত হোক।"

রাজা হুকুম করলেন তাই হোক।

প্রথমে ডাকা হলো সেই আড়তদারকে যে রাজপ্রাসাদে ময়দা সাপ্লাই করে। ঠক ঠক করে কাঁপতে-কাঁপতে রাজাকে প্রণাম জানিয়ে সে বললো, "ধর্মাবতার, আমি কিছুই জানি না। এই গম আমি কিনেছিলাম এক চাষীর কাছ থেকে।"

চাষীর নাম ঠিকানা নিয়ে রাজার পেয়াদা ছুটলো সেই গ্রামের দিকে চাষীকে ধরে আনতে।

চাষী এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো রাজাকে। সমস্ত অভিযোগ শুনে সে বললো, "মহারাজ, আমি আপনার সামনে মিথ্যাচারী হবো না। যখন গম কাটা হচ্ছিল তখন একটা বন্যবরাহ ওইখানে হাজির হয়েছিল।"

"হোয়াট ইজ বন্যবরাহ ?" জিজ্ঞেস করলো তিলক।

বাংলায় এক্সপার্ট বুলবুল বললো, "বুনো শূয়োর। হিন্দুরা খুব খেতো এককালে।"

"বাঃ।" ছোটমামা প্রশংসা করলেন। তারপর আবার শুরু করলেন গল্প।

চাষী স্বীকার করলো, "মহারাজ, যেখানে গম ডাঁই করে রেখেছিলাম তার ওপরেই আমি বন্যবরাহকে মেরে ফেলি। মহারাজ, আমি আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করছি, যে-গমগুলোর ওপর বরাহ-রক্ত পড়েছিল সেগুলো সরিয়ে ফেলা সম্ভব হয় নি।"

বিস্মিত রাজা নিজের কানেই শুনলেন, বড়ভাই যা মন্তব্য করেছিল তা মিথ্যে নয়।

এবার ঘি-ওয়ালার পালা। চোখের সামনে চাষীর অবস্থা দেখে সে আর মিথ্যে বলতে সাহস করলো না। সে সরাসরি স্বীকার করলো, এক ঝাড়ুদারের কাছ থেকে সে কমদামে ঘি সংগ্রহ করেছিল। এই ঝাড়ুদার যে এঁটো পাতা থেকে ঘি সংগ্রহ করে নি এমন গ্যারান্টি নেই।

ঘি-এর খবরটা পেয়ে রাজার লজ্জার অবধি নেই। খোদ রাজপ্রাসাদেই খাবার-দাবার নিয়ে এইরকম কাণ্ড চলতে পারে তা তিনি ভাবেন নি।

এবার যে দুধ দেয় সেই গোয়ালাকে ডেকে পাঠানো হলো। প্রতিদিন কয়েক সের খাঁটি গোরুর দুধ দেওয়ার কথা, তাতে মানুষের দুধের গন্ধ কী করে হবে ?

মুখ কাঁচুমাচু করে মাথা চুলকে গোয়ালা বললো, "মহারাজ, এরকম আর কখনও হবে না, এবারের মতো আমাকে ক্ষমা করুন। গোয়ালিনী তার কোলের ছেলেটিকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিল। আমি সেই সময় দুধের ঘটিটা তার খুব কাছে রেখেছিলাম। ছেলেটি আচমকা পাশ ফেরার চেষ্টা করায় গোয়ালিনীর বুকের দুধ কয়েক ফোঁটা দুধের ঘটিতে পড়ে যায়। আমি ভগবানের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, এমন অঘটন আর কখনও ঘটবে না।"

যে কলাপাতা সরবরাহ করে তার ডাক পড়লো এবার। সে বুঝলো পরিস্থিতি মোটেই সুবিধে নয়, তাই হাঙ্গামা না বাড়িয়ে সত্যি কথা স্বীকার করলো। "মহারাজ, গোবর জলেই পাতা ধোয়া হয়েছিল—কাছাকাছি পাতকুয়োর জল ছিল না।"

চার ভাই যা বলেছে তা অক্ষরে-অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হতে দেখে রাজা এবং তাঁর সভাসদরা বিস্মিত হলেন।

রাজা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "আপনাদের মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বুদ্ধিমান লোক সংসারে বেশী নেই। আপনাদের চুরির মামলার সমাধান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনারা বরং ধরমপুরের রাজার কাছে যান। উনি খুবই বিচক্ষণ নরপতি —হয়তো আপনাদের সাহায্য করতে পারবেন।"

রাজ-অতিথিশালা থেকে বিদায় নিয়ে পরের দিন চার ভাই ধরমপুরে হাজির হলো। যথাসময়ে রাজদর্শন হলো এবং চার ভাই তাঁদের সমস্ত ঘটনা রাজার কাছে নিবেদন করলেন। এবার তারা একসঙ্গে করজোড়ে ধরমপুরের রাজাকে বললো, "মহারাজ,

এমনভাবে বিচার করে দিন যাতে আমাদের ভায়ে-ভায়ে সম্প্রীতি নষ্ট না হয়।"

ছোটভাই তো সেই হিন্দী গানটা আবার গেয়ে ফেললো :

মাল পায়ে আপনো চোর না জানিও যায়ে
প্রীত-রীত দিন দিন বাঢ়ে, কি যে সোই উপায়ে।

পরমপুরের রাজা ঠিক করলেন, এদের বুদ্ধির দৌড়টা একবার পরীক্ষা করে নেওয়া যাক। রাজসিংহাসনের তলা থেকে একটা মাটির ভাঁড় বার করলেন তিনি। বললেন, "এই ভাঁড়ের মুখ বন্ধ। কিন্তু বলুন তো এর ভিতর কী আছে ?"

বড়ভাই ভাঁড়টা নিজের হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলো। তারপর বললো, "এর ভিতর কোনো গোল জিনিস আছে।"

ভাঁড়টা এবার মেজভায়ের হাতে দেওয়া হলো। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে সে বললো, "ঠিকই। ভিতরের জিনিসটা গোল এবং তার রং লাল।"

সেজভাই এবার ভাঁড়টা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে সে বললো, "এই লাল এবং গোল জিনিসটার ভিতরে বিচি আছে।"

ছোটভাই এবার ভাঁড়টা হাতে নিয়েই মন্তব্য করলো, "বলবার কি আছে, মহারাজ ? ভাঁড়ের মধ্যে নিশ্চয় একটা ডালিম আছে।" রাজার মন্তব্যের জন্যে অপেক্ষা না-করে সে এবার ভাঁড়টা ভেঙে ফেললো এবং একটা রাঙা টুকটুকে গোল ডালিম বেরিয়ে এলো।

চার ভায়ের বুদ্ধি দেখে রাজা খুব খুশী হলেন। কিছুক্ষণ ভেবে

বললেন, "আপনারা যে রহস্য নিয়ে এসেছেন তার সমাধান আমার পক্ষে সম্ভব নয়। চোরাই মাল ধরা পড়বে, অথচ কে চোর তা আপনাদের জানানো যাবে না, এ কী করে সম্ভব তা আমার মাথায় আসছে না। আপনারা বরং ধারানগরীতে চলে যান।"

অগত্যা চার ভাই ধারানগরীর উদ্দেশে রওনা হলো। ধরমপুর থেকে ধারানগরীর পথ অনেকখানি।

ধারানগরীতে পৌঁছে চার ভাই অনেক খবরাখবর জোগাড় করলো। স্বর্ণগড়ের রাজকুমারী এই ধারানগরীকে ভারত বিখ্যাত করে তুলেছেন। একটি পর্দার আড়ালে বসে স্বর্ণগড়ের এই সুন্দরী সমস্ত লোকের সমস্যা শোনেন এবং বিচার করেন। তাঁর বিচারের খ্যাতি ইতিমধ্যেই দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে।

বুলবুল বললো, "মামা, তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রাচীন ভারতেও মহিলা জজ ছিলেন এবং তাঁরা খুব ভাল কাজ করতেন।"

"ঠিক বলেছো বুলবুল," মামা সায় দিলেন। "দেখা যাচ্ছে, মেয়ে জজের এমন সুনাম যে অন্য দেশের লোকরাও সেখানে বিচার-প্রার্থী হয়ে আসতে সঙ্কোচ বোধ করতেন না। আর একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করো। জায়গাটার নাম ধারানগরী—তোমরা তো জানো এখনও আমাদের প্রত্যেকটা আইন কতকগুলো ধারায় বিভক্ত। নিয়ম, পদ্ধতি, রীতি এবং আইনের ক্রমিক বিধিকেই ধারা বলে।"

"রাজপ্রাসাদের অলিন্দে বসে স্বর্ণগড়ের রাজকুমারী বিচার করতেন। তোমরা অলিন্দ বোঝো তো? ঝুল-বারান্দা, ইংরিজীতে

যাকে ব্যালকনি বলে।"

রাজপ্রাসাদের প্রধান দ্বারে বিরাট একটা দুন্দুভি থাকে। যদি কেউ বিচারপ্রার্থী হতে চায় তবে তাকে ওই দুন্দুভি বাজাতে হবে। আওয়াজ পেয়েই ধারানগরীর সুন্দরী রাজকুমারী অলিন্দে এসে বসবেন এবং পর্দার আড়াল থেকে সমস্ত অভিযোগ শুনবেন।

এবারও বিরাট দুন্দুভি জলদগম্ভীর স্বরে বেজে উঠলো এবং রাজকুমারী চকিতচরণে অলিন্দে উপস্থিত হলেন।

চার ভাই তখন নিজেদের সমস্যার কথা সবিস্তারে রাজকুমারীকে জানালো এবং বললো, "হে রাজনন্দিনী, আমরা ওই রহস্যময় চতুর্থ পাথরটি ফিরে পেতে আগ্রহী ; কিন্তু কে চোর তা কিছুতেই জানতে চাই না। আমাদের ভাইদের মধ্যে যাতে প্রীতির বন্ধন দিন দিন বাড়ে তার জন্য আমরা আপনার সাহায্যপ্রার্থী।"

রাজকুমারী মন দিয়ে সব শুনলেন। তারপর বললেন, "বড় কঠিন দায়িত্ব। বিচারের ভার আপনারা আমার ওপর দিচ্ছেন। এখনই আমি রায় দিতে পারবো না। অনুগ্রহ করে আপনারা অন্তত এক পক্ষ কাল এখানে থেকে যান।"

"পক্ষ মানে কতো ?" জিজ্ঞেস করলো তিলক।

"দুই পক্ষে এক মাস," বুঝিয়ে দিলেন ছোটমামা। "শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ কথা দুটো নিশ্চয় তোমাদের কানে গিয়েছে।"

নিজেদের কাজকর্মের অনেক ক্ষতি হবে। কিন্তু উপায় নেই—চার ভাই এক পক্ষকাল ধারানগরীতে থাকতে রাজী হয়ে গেলেন।

তখন রাজকুমারী চার ভাইকে বললেন, "এই ক'টাদিন কিন্তু আলাদা-আলাদা থাকতে হবে—আপনারা কেউ কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবেন না। আমার গুপ্তচরবা কিন্তু আপনাদের ওপর নজব রাখবে। হারানো মানিক খুঁজে পাওয়া মাত্রই এই বিচ্ছেদ পর্ব শেষ হবে।"

পরের দিন রাজকুমারী প্রথমে বড়ভাইকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, "আপনাকে একটা গল্প শোনাতে চাই।"

"সে তো আমার সাতজন্মের সৌভাগ্য। স্বয়ং রাজকুমারীর শ্রীমুখে গল্প শোনার সুযোগ ক'জনের হয়?" বড়ভাই বিনাতভাবে উত্তর দিলেন।

রাজকুমারী তখন গল্প শুরু করলেন—

এক দেশে এক রাজা ছিল। রাজপুত্রের সঙ্গে সবচেয়ে ভাব ছিল দেওয়ানপুত্রের। দু'জনে একসঙ্গে খেলাধুলো করে, একসঙ্গে শিকারে যায়, একসঙ্গে দিনের পর দিন গল্পে মেতে থাকে। বন্ধুতে বন্ধুতে এতো ভাব শোনা যায় না। দু'দিন দেখা না-হলে দু'জনেই ছটফট করে।

একবার এই দুই বন্ধু নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা তামাসা করতে করতে অদ্ভুত এক প্রতিজ্ঞা করে বসলো। রাজকুমার বললো, "যে আমাদের মধ্যে প্রথমে বিয়ে করবে, ফুলশয্যার রাত্রে সে তার বউকে বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দেবে।"

দেওয়ানপুত্রও সঙ্গে সঙ্গে বলে বসলো, "অতি উত্তম প্রস্তাব। আমি রাজী।"

ভাগ্যচক্রে কিছুদিন পর রাজকুমারের বিয়ের ব্যবস্থা হলো। রমাসুন্দরী এক কন্যাকে ভিন দেশ থেকে বধূ হিসেবে নিয়ে এলো াজপুত্র।

ফুলশয্যার রাত্রে রাজকুমারের হঠাৎ বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞার থা মনে পড়ে গেলো। কথার খেলাপ হওয়াটা মোটেই ভাল থা নয়, রাজপুত্র ভাবতে লাগলেন।

রাজকুমারকে গম্ভীর দেখে নববধূ জিজ্ঞেস করলো, "তোমাকে তো চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন ?"

একটু দ্বিধার পর রাজকুমার তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্ত্রীকে ললেন।

নববধূ সব শুনে স্বামীকে বললেন, "চিন্তার কিছু নেই। তুমি খন কথা দিয়েছো তখন তার সম্মান আমাকে রাখতেই হবে।"

গভীর রাত্রে স্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সালঙ্করা সুবেশিনী বধূ গোপনে দেওয়ানপুত্রের নিবাসের দিকে একাকিনী ওনা হলেন।

পথ জনহীন। কোথাও কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই। পথের প্রান্তে কয়েকটি দুর্ধর্ষ দুরাত্মা অপেক্ষা করছিল। বহুমূল্যবান মণিমানিক্যে সজ্জিতা একাকিনী বধূকে দেখে দুর্বৃত্তরা আর লোভ সংবরণ করতে পারলো না। ডাকাতদের একজন এগিয়ে এসে পথ অবরোধ করলো। বললো, "যা কিছু মূল্যবান জিনিস আছে তা আমরা কেড়ে নেবো।"

নববধূ তখন সরল মনে ডাকাতসর্দারকে বললো, "আপনি

আমার বাবার মতো। স্বামীর সম্মান রক্ষা করতে মধুযামিনীর রাতে একটি লোকের সঙ্গে গোপনে দেখা করতে চলেছি। এখন আমার অলঙ্কার খোয়া গেলে মুশকিলে পড়বো। আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন। ফিরবার পথে আপনারা যা-যা চাইবেন আমি সব দেবো।"

অন্য দুর্বৃত্তরা বধূর কথায় বিশ্বাস করতে পারছিল না— এতোগুলো অলঙ্কার কেড়ে নেবার সুযোগ ছাড়াটা বোধহয় ঠিক হবে না। কিন্তু ডাকাতসর্দার কী ভেবে যুবতীকে যাবার অনুমতি দিলো এবং বললো, "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরবে। আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।"

নববধূ এবার কোনোক্রমে দেওয়ানপুত্রের বাড়ি পৌঁছে তার শোবার ঘরের দরজায় মৃদু টোকা দিতে লাগলো। দেওয়ানপুত্রও সেদিন ঘুমোয় নি। নববিবাহিত বন্ধু ফুলশয্যার রাতে তার কথা রক্ষা করে কিনা দেখবার জন্যে সে অপেক্ষা করছিল। আওয়াজ শুনেই সে দরজা খুলে দিয়ে, নববধূকে সাদরে আহ্বান করলো। বললো, "এসো বোন এসো। তোমার জন্যেই আমি বসে আছি।"

নতুন বোনের জন্য নানা উপহার কিনে রেখেছিল দেওয়ানপুত্র। সেইসব অলঙ্কার পরে নিলো নববধূ। তারপর একটু মিষ্টিমুখ করে সে নিঃশব্দে আবার পথে বেরিয়ে পড়লো।

মাঝপথে এসে ডাকাতদের কথা মনে পড়ে গেলো নববধূর। দূর থেকে সে দেখলো এখনও তারা পথের ধারে অপেক্ষা করছে। অন্য পথ ধরে গেলে সে ডাকাতদের এড়িয়ে যেতে পারতো। কিন্তু

কথা দিয়েছে সে। তাই ডাকাতদের কাছেই সে ফিরে গেলো এবং বললো, "কাজ শেষ করে আমি ফিরে এসেছি। এবার আপনারা আমার কাছ থেকে যা নিতে চান নিন।"

কয়েকজন ডাকাত দেখলো অলঙ্কারের পরিমাণ আরও বেড়েছে—তাদের খুব লোভ হতে লাগলো। এতো দামী দামী গয়না লুঠের সুযোগ জীবনে ক'বার আসে?

কিন্তু ডাকাতসর্দারের চোখ দিয়ে তখন জল গড়াতে শুরু করেছে। মেয়েটির সরলতায় তার পাষাণ হৃদয় গলে গিয়েছে। সে বললো, "না মা, তুমি যেমনভাবে এসেছো তেমনভাবে স্বামীর কাছে ফিরে যাও। তুমি যে আমাকে বাবা বলেছো।"

যাবার আগে ডাকাতসর্দার মেয়েটিকে একটি সোনার মোহর উপহার দিলো।

নববধূ বাড়ি ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে রাজপুত্রকে বর্ণনা করেছিল। সব শুনে রাজপুত্র অবশ্যই খুব খুশী হয়েছিল।

এই পর্যন্ত বলে ধারানগরীর রাজকুমারী চুপ করলেন। বড়ভায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "এখন আপনার কিছু কাজ আছে। শুনেছি আপনি খুব বুদ্ধিমান। আপনি বলুন, এই রাজপুত্র, নববধূ, ডাকাতসর্দার ও দেওয়ানপুত্র সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী?"

বড়ভাই খুব মন দিয়ে গল্পটা শুনেছে। সে আরও একটু চিন্তা করলো, তারপর বললো, "এরা চারজনই খুব সৎ মানুষ। সৎ মানুষ না হলে রাজপুত্র তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেন না—কত

লোক তো কত প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু ক'জন তা শেষ পর্যন্ত মান্য করে? এ-ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি না রাখলে কিছুই হতো না, তবু রাজপুত্র তা রেখেছেন।

নববধূর ভূমিকাটিও অতি সুন্দর। স্বামী যেহেতু কথা দিয়েছেন সেহেতু তা হাসিমুখে মেনে নিয়ে বধূটি স্ত্রীর যোগ্য কাজই করেছে, যদিও সে সহজেই বেঁকে বসতে পারতো। দুর্বৃত্তদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে আবার তাদের কাছে ফিরে গিয়ে সে দ্বিতীয়বার সততার পরিচয় দিয়েছে।

ডাকাতরাও যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছে তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না। আর দেওয়ানপুত্রও বন্ধুত্বের যথাযথ সম্মান রক্ষা করেছে। সে যে সততার পরিচয় দিয়েছে তাও প্রশংসাযোগ্য।"

ধারানগরীর রূপসী রাজকুমারী মন দিয়ে সব শুনলেন। কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন না। তিনি এবার মেজভাইকে ডেকে পাঠালেন।

একান্তে মেজভাইকেও তিনি একই গল্প শোনালেন এবং রাজপুত্র, নববধূ, ডাকাত ও দেওয়ানপুত্র সম্বন্ধে তার মতামত জানতে চাইলেন।

মেজভাই একটু ভেবে বড়ভায়ের মতো একই মন্তব্য করলো। "রাজকুমারী, এই চারটি চরিত্রই সৎ। এরা অত্যন্ত ভালমানুষ।"

এবার সেজভায়ের পালা। গল্প শুনে সেও রাজকুমারীকে একই উত্তর দিলো।

ধারানগরীর রূপসী রাজকন্যা এবার ছোটভাইকে একান্তে

ডকে পাঠালেন। পর্দার আড়াল থেকে পুরনো গল্পটা তিনি পুনরায় শোনালেন এবং ছোটভায়ের মতামত জানতে চাইলেন।

ছোটভাই বললেন, "রাজকুমারী, আপনি যদি আমার সঠিক মন্তব্য চান তাহলে বলবো রাজপুত্র একটি গর্দভ। ফুলশয্যার রাত্রে নিজের বউকে বন্ধুর বাড়িতে পাঠানো বোকামি ছাড়া কী? মেয়েটির চরিত্র মোটেই ভাল নয়। ভাল মেয়ে হলে সে কিছুতেই হুট করে মধ্যরাতে অপরিচিত লোকের বাড়িতে একলা যেতো না। দেওয়ানপুত্রটিও একটি বোকচন্দর। এমন সুযোগের সে সদ্ব্যবহার করলো না। আর ডাকাতরাও খুব বোকা, শুধু শুধু অতোগুলো মণিমাণিক্যখচিত অলঙ্কার সে হাতছাড়া করলো।"

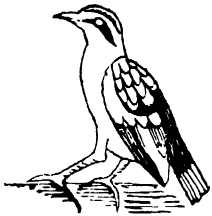
ছোটভায়ের উত্তর শেষ হওয়া মাত্রই রাজকুমারী বুঝতে পারলেন ভাইদের মধ্যে কে চুরি করেছে। রাজকুমারী গম্ভীরভাবে ছোটভাইকে বললেন, "আপনার বাবার মহামূল্যবান পাথরটা আপনিই চুরি করেছেন। এখুনই পাথরটা আমাকে দিন। না-হলে আপনি খুব বিপদে পড়ে যাবেন। তাড়াতাড়ি করুন, অযথা আমার সময় নষ্ট করবেন না।"

ছোটভাই প্রথমে একটু গড়িমসি করলো। তারপর বুঝলো ধারানগরীর এই রাজকুমারীর সঙ্গে বুদ্ধির লড়াইয়ে পারা যাবে না। সে স্বীকার করলো মূল্যবান পাথরটা সে-ই গোপনে সরিয়ে ফেলেছিল। জামার ভিতরের একটা গোপন পকেট থেকে পাথরটা বের করে সে ধারানগরীর রাজকুমারীর হাতে দিয়ে দিলো।

রাজকুমারী তারপরে আর ছোটভাইকে বিপদে ফেলেন নি।

চার ভাইকে তিনি একসঙ্গে ডেকে পাঠালেন। এবং পাথরটা বার করে বললেন, "এই নিন আপনাদের হারানো মানিক। কে চুরি করেছিল, কীভাবে এটা উদ্ধার হলো, এসব আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। হারানো মানিক নিয়ে আপনারা স্বদেশে ফিরে যান। আপনাদের ভায়ে-ভায়ে সম্প্রীতি আরও বাড়ুক।"

ভাইরা খুব খুশী হয়ে, রাজকুমারীর জয়গান গাইতে-গাইতে নিজেদের গ্রামে ফিরে গিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাতে লাগলো।



চার ভায়ের গল্প শুনে শিবাজী, তিলক ও বুলবুল তিনজনেই খুশি। বুলবুল তো রাজকুমারীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

দুই ভাইকে শুনিয়ে সে বললো, "দেখলে তো মেয়েদের বুদ্ধি! রাজকুমারী না-থাকলে চার ভায়ের কী অবস্থা হতো বুঝতে পারছো?"

তিলক ও শিবাজীর মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তারা তাই অন্য পথ ধরলো। অকারণে ঘরের মধ্যে হৈ-চৈ করতে লাগলো। বুলবুলের কথাটা যেন তাদের কানেই ঢুকছে না।

গোলমালের মাত্রা বেড়েই চলেছে। কানের পর্দা ফাটবার অবস্থা!

"স্টপ! স্টপ!" অবস্থা বেগতিক দেখে ছোটমামা আবার হাল ধরলেন। "নো মোর গণ্ডগোল।"

"কেন? গোলমালে কী হয়?" শিবাজী গোলমাল একটু কমিয়ে ছোটমামাকে জিজ্ঞেস করলো।

ছোটমামা ওর পিঠে হাত রেখে বললেন, "আর একটু বড় হলে তোমরা জানতে পারবে বেশী শব্দ মানুষের শরীর-স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ভাল নয়। বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা এই নয়েজ-

পলিউসন নিয়ে গবেষণা করছেন এবং বড় বড় শহরে নানা যন্ত্র দিয়ে গোলমাল মাপা হচ্ছে।"

"ওরে বাবা! গোলমালও মাপা যায় নাকি?" বিশ্বাস করছে না তিলক।

কিন্তু বুলবুল এবার বকুনি লাগালো। "চুপ করে শোনো। ছোটমামা কি তোমাদের মিথ্যে কথা বলবে? নিশ্চয় ছোটমামা গোলমাল মাপার যন্তর দেখেছে। বাবার কাছে শুনেছি, সহ্যের অতিরিক্ত গোলমাল হলে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে। গোলমালের চোটেই তো সেবার বড় জেঠু অজ্ঞান হয়ে গেলেন।"

গোলমালের মাত্রা কিন্তু তেমন কমছে না। ছোটমামা অগত্যা পরিস্থিতি আয়ত্তে আনবার জন্যে লোভ দেখালেন, "তোমরা যদি আমার কথা শোনো, বেশী হট্টগোল না করো, তা হলে আর একখানা গপ্পো শোনাতে পারি।"

"হিপ-হিপ-হুররে! ছোটমামা তুমি যুগ যুগ জিও।" মনের আনন্দে শিবাজী শ্লোগান তুললো।

"এটা আবার কোথা থেকে শিখলি?" ছোটমামা একটু ঘাবড়ে গেলেন নতুন শ্লোগান শুনে।

"কেন? তোমাদের দেওয়ালেতে লেখা আছে।" শিবাজী সঙ্গে সঙ্গে ছোটমামাকে জানিয়ে দিলো।

কথাটা ছোটমামার পছন্দ না-হলেও চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় নেই—কলকাতা শহরের অর্ধেক দেওয়ালেই কথাটা যে লেখা থাকে তা অস্বীকার করবেন কী করে?

ভাগ্নী এবং ভাগ্নাদের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ছোটমামা বললেন, "আগের গপ্পোটা ছিল মধ্যপ্রদেশের। এবার একটা উত্তর প্রদেশের গপ্পো শোনো। এই উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জনপদে যে কত উপকথা ছড়িয়ে আছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আমার বন্ধু ডক্টর অনুরাধা চৌহানের মুখে কিছু গল্প শুনেছি—তারই একটা তোমাদের বলবো।"

তিলক আর চুপ করে থাকতে পারলো না। "আমার স্পেশাল রিকোয়েস্ট ছোটমামা—একখানা হাসির গল্প শোনাও। দুঃখের ঘটনা আজকাল আমার ভাল লাগে না।"

বুলবুল ও শিবাজীও বলে উঠলো, "প্লীজ মামা। একখানা হাসির গল্পই হোক।"

মাথা চুলকে ছোটমামা বললেন, "যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রাম সন্না! মাঝে মাঝে দুঃখের কাহিনী শুনতে হয়। কিন্তু তোমরা আমার আদরের ভাগ্নাভাগ্নী। তোমরা যখন হাসি চাইছো তখন অ্যাজ এ স্পেশাল কেস এক বোক্‌চন্দ্রের ঘটনা শোনো।"

"এক গ্রামে এক লোক ছিল। নাম তার ভুলুয়া। যাদের বুদ্ধিসুদ্ধি কম, যাঁরা মাথামোটা তাদের এরকমই নাম হয়, তোমরা জানো। গ্রামের সমস্ত লোক এবং অন্যগ্রামের আত্মীয়স্বজন সবাই জানে ভুলুয়া বোকা, তার একটু সাবধানে থাকা উচিত এবং বিপদ এড়াবার জন্যে যতটা সম্ভব ভেবেচিন্তে চলা দরকার।"

"কিন্তু যারা বোকা তাদের একটা বিশেষ লক্ষণ থাকে। লক্ষণটা কী বলো তো?" তিলকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন

ছোটমামা। ছোটমামার ওই একটা দোষ, গল্প বলতে বলতে উদ্ভট সব প্রশ্ন করে বসেন।

কিন্তু তিলক, শিবাজী ও বুলবুলের বুদ্ধি কম নয়। তারাও টপাটপ নির্ভুল উত্তর দিয়ে ছোটমামাকে তাক লাগিয়ে দেয়। এবারেও তিলক তার প্রমাণ দিলো। এক মিনিট দেরি না করে সে বললো, "বেশীর ভাগ বোকা জানে না যে তারা বোকা, তাদের ধারণা খুব চালাক তারা।"

"সব বোকা যদি জানতো যে তারা বোকা তাহলে পৃথিবীতে অনেক হাঙ্গামা কম হতো।" এবার খুব ভাল উত্তর হয়েছে, স্বীকার করলেন ছোটমামা। মিষ্টি হেসে ছোটমামা বললেন, "আমাদের এই ভুলুয়া কিন্তু সেরকম নয়—সে অত্যন্ত গোবেচারা মানুষ। সবার কথা শুনে, আত্মীয়দের সমস্ত উপদেশ মান্য করেই ভুলুয়া চলতে চায়।"

"তারপর?" জিজ্ঞেস করলো বুলবুল। গল্প আরম্ভ হলেই শেষে কী হবে জানবার জন্যে তার প্রাণটা ছটফট করে। এই জন্যে অনেক বইয়ের শেষ পাতাটা বুলবুল আগেই পড়ে নেয়—কিন্তু এটা ঠিক নয়। তিলকও বলেছে, প্রথম পাতা থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে শেষের পাতায় পৌঁছতে হয়। ঝপাং করে লাফ দিয়ে শেষের পাতায় পৌঁছনো খুব অন্যায়।

বুলবুলের দিকে তাকিয়ে ছোটমামা বললেন, "ভুলুয়ার বউ একদিন বললো, আমার মন খারাপ। আদরের ছোট বোনটাকে কত দিন দেখিনি। ওর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে মনটা ছটফট

করছে। তুমি আমার আইবুড়ো বোনটাকে কয়েক দিনের জন্যে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এসো।"

"আইবুড়ো মানে কী?" রাউরকেলা ইংলিশ ইস্কুলের ছাত্র তিলক বসু এই কথাটা আগে শোনে নি।

"নাথিং টু ডু উইথ বুড়ো।" ভাইকে মানেটা বোঝাবার জন্যে বুলবুল ব্যগ্র হয়ে উঠলো। "আইবুড়ো মানে যার বিয়ে হয় নি।"

"ইন দিস কেস তাহলে আইবুড়ী!" তিলক মন্তব্য করলো।

"ছেলেমেয়ে যাই হোক, বিয়ে না-হলে আইবুড়ো।" বুলবুল এবার হেসে উঠলো।

ছোটমামা মন দিয়ে ওদের কথা শুনছিলেন। তিনি এবার বললেন, "বুড়োবুড়ী কারুর সঙ্গেই সম্পর্ক নেই। মূল সংস্কৃত কথাটা হলো 'অব্যূঢ়' অর্থাৎ অবিবাহিত। অনেক গ্রামে বর যে পথ দিয়ে বিয়ে করতে যায় সেপথ বদলিয়ে অন্য পথ দিয়ে বাড়ি ফেরে—এর নাম আইবুড়ো পথ ভাঁড়ানো।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং, ছোটমামা। প্রত্যেকটা কথার পিছনে কত মজার মজার ঘটনা লুকনো রয়েছে। তুমি এবার ভুলুয়ার ঘটনাটা বলো।" তিলক অনুরোধ করলো।

ছোটমামা বললেন, "আমাদের ভুলুয়া কখনও বউয়ের অবাধ্য হয় নি। বাক্স-প্যাটরা বেঁধে শ্বশুরবাড়ি যাবার জন্যে সে তৈরি হয়ে নিলো। মালপত্তর মাথায় তোলবার আগে সে এক ছিলিম তামাক সেজে হুকোয় গুড়ুক গুড়ুক করে সুখ-টান দিচ্ছে, এমন সময় ভুলুয়ার খুড়তুতো দাদা বাড়িতে এসে পড়লেন। লটবহর

দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ভুলুয়া, কোথায় চললে তুমি ?"

ভারিক্কি চালে ভুলুয়া উত্তর দিলো, "বউয়ের বোনকে আনতে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি।"

ভুলুয়ার দাদা তো জানেন ভাইকে। তাই তিনি চিন্তিত হয়ে উঠলেন। বললেন, "ভুলুয়া তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি কম, তোমাকে খুব সাবধানে চলতে হবে, না-হলে শ্বশুরবাড়িতে অশেষ দুর্গতি হবে তোমার।"

শ্বশুরবাড়িটা সুখের জায়গা, সেখানে কে আর কষ্টে পড়তে চায় ? ভুলুয়া তাই দাদাকে চেপে ধরলো, "কিছু সৎ পরামর্শ দাও যাতে হাঙ্গামা এড়ানো যায়।"

ভুলুয়ার দাদা অনেক ভেবেচিন্তে বললেন, "আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোনো। কখনও উদ্ধত হবে না, লোকের সঙ্গে দেখা হলে বিনয় দেখাবে এবং বলবে, 'নমস্কার'। কিছুতেই শ্বশুরবাড়িতে বেশী মুখ খুলবে না—যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী একটি কথাও বলবে না। অবস্থা বুঝে কখনও 'হ্যাঁ' কখনও 'না' বলে ম্যানেজ করবে।"

দাদার উপদেশ অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলবার প্রতিজ্ঞা করলো ভুলুয়া এবং যথাসময়ে মালপত্তর মাথায় করে শ্বশুরবাড়ির পথে বেরিয়ে পড়লো।

গাঁয়ের সীমানা পেরিয়ে ধান ক্ষেতের আল ধরে মনের আনন্দে এগিয়ে চলেছে ভুলুয়া। আঃ! কতদিন পরে সে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। সেখানে সে কত খাতির পাবে। যেতে যেতে ভুলুয়া এক জায়গায় দেখলো এক পাখিধরা বেদে জাল পেতে বসে আছে। ঠিক সেই

সময় বেশ কয়েকটা পাখি জালের মধ্যে এসে বসেছে, পাখিধরা ব্যাধ জাল টেনে তাদের বন্দী করতে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তে ভুলুয়া হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে উঠলো, "নমস্কার ভাই, নমস্কার।"

আচমকা চিৎকার শুনে পাখিধরা চমকে উঠলো, আর পাখিগুলো সেই সুযোগে ফুড়ুক করে উড়ে পালালো।

পাখি ধরতে না-পেরে ব্যাধ ভীষণ রেগে ভুলুয়ার গালে ঠাস করে এক চড় লাগালো। "গর্দভ কাঁহাকার। আমার রুজিরোজগার নষ্ট করলি তুই। সমস্ত পাখি পালালো, এখন আমার কী হবে?"

ভুলুয়া বেশ ফাঁপরে পড়ে গেলো। হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে সে বললো, "আপনি কিছু মনে করবেন না। দাদা আমাকে বলেছিল, লোক দেখলেই নমস্কার জানাতে। এখন বুঝছি খুব ভুল হয়েছে। দয়া করে আমাকে বলুন, আমার কী বলা উচিত?"

পাখিধরার রাগ ততক্ষণে একটু কমেছে। সে বললে, "তোর বলা উচিত: এসো এসো, ধরা পড়ো।"

ভুলুয়া বললো, "আমি কথা দিচ্ছি আর কখনও ভুল কথা বলে আমি বোকা বনছি না।"

মাথায় মাল তুলে ভুলুয়া আবার হাঁটতে শুরু করেছে। মাইল খানেক পথ পেরিয়ে চলে এসেছে সে। চুরি করে কয়েকটা চোর সেই সময় বাড়ি ফিরছিল। নতুন লোক দেখেই ভুলুয়া মনে মনে বললো, "নমস্কার জানিয়ে আমি আর বোকা বনছি না।"

চোরদের মুখোমুখি হওয়া মাত্র ভুলুয়া চিৎকার করে বলে উঠলো, "এসো এসো, ধরা পড়ো।"

সেই না শুনে চোরগুলো ভীষণ চটিতং। ভুলুয়াকে ধরে তারা উত্তম মধ্যম দিলো। উত্তম মধ্যম জানো তো? প্রচণ্ড মারের বাংলা প্রতিশব্দ।

মার লাগিয়েও চোরদের রাগ কমলো না। একজন চোর ছুরিখানা ভুলুয়ার নাকের ডগায় নাচিয়ে বললো, "এ-বারে খুব জোর জানে বেঁচে গেলি। ফের যদি ওই অলুক্ষণে কথা মুখে আনিস তা হলে মুণ্ডু আর ধড় আলাদা হয়ে যাবে।"

গর্দান বাঁচাবার জন্যে হাত জোড় করে কাঁদ-কাঁদ গলায় ভুলুয়া বললো, "হুজুর আপনারা আমার মা-বাবা! আপনাদের কোনো ক্ষতি আমি করতে চাই নি। কিন্তু বুঝতে পারছি, যা বলেছি তা মুখে আনা উচিত হয়নি আমার। দয়া করে আপনারা শিখিয়ে দিন আমার কী বলা উচিত?"

ছুরিখানা কোমরে গুঁজতে-গুঁজতে চোরের সর্দার উপদেশ দিলো, "ব্যাটা বাঁচতে যদি চাস তাহলে তুই বলবি, আউর লে আও, আউর লে আও।"

হিন্দী কথাটা মুখস্থ করে নিলো ভুলুয়া। ঠেকে শিখতে হয়েছে তাকে। আর ভুল করবে না কিছুতেই।

আবার রাস্তা দিয়ে চলেছে ভুলুয়া। এমন সময় দূর থেকে শব-দাহের দল দেখা গেলো। খুব নিকট এক আত্মীয়ের মৃতদেহ খাটিয়ায় চাপিয়ে কয়েকজন লোক চলেছে শ্মশানে।

ভুলুয়া এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করলো না। গলা চড়িয়ে বললো, "আউর লে আও, আউর লে আও।"

লোকটা বলে কী! ভীষণ চটে উঠলো শবযাত্রীরা। রেগে মেগে তারা ভুলুয়াকে যোগ্য শিক্ষা দেবার জন্যে তার ঘাড়ে রদ্দা মারতে যাচ্ছিল। এমন সময় ভুলুয়া কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললো, "আমার অপরাধ নেবেন না। আমাকে একজন বলে দিয়েছিল, এইভাবে কথা বলতে। আমি নাকখত দিচ্ছি এই ভুল আর করবো না। দয়া করে আপনারা বলে দিন আমার কী বলা উচিত?"

শবযাত্রীরা ভুলুয়ার ঘাড়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বললো, "ওরে বোকচন্দর, বলবি, এমন যেন আর কখনও না হয়। মনে থাকবে তো?"

"মনে থাকবে না আবার! ঠেকে শিখলে কেউ ভোলে?" ভুলুয়া জায়গাটা ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচে।

আবার চলেছে ভুলুয়া। কিছুটা পথ গিয়ে ভুলুয়া দেখলো একদল বরযাত্রী খুব হৈ-হৈ করে বরকে নিয়ে বিয়েবাড়ি চলেছে।

ভুলুয়া মনে মনে বললো, "এবার আর ভুল হচ্ছে না—যা বলবার তাই বলবো এবার!"

বরযাত্রীরা যেমন তার কাছে এসেছে অমনি ভুলুয়া বলে উঠলো, "ভাই, এমন যেন আর কখনও না হয়।"

সেই না শুনে বরযাত্রীরা খুব চটে উঠলো। শুভ কাজে চলেছি, এই সময় কিনা যত অলক্ষণে কথা বলা! কয়েক ডজন চাঁটি আর কিল পড়লো ভুলুয়ার মাথা এবং পিঠের ওপর।

এবার কিন্তু ভুলুয়া আর বোকামি করে জিজ্ঞেস করেনি, আমাকে কী বলতে হবে শিখিয়ে দিন। অচেনা লোকের কাছে কোনোরকম উপদেশ না নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।

কিল চড় চাঁটি হজম করে আদরের জামাই ভুলুয়া অবশেষে শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছলো। শ্বশুরবাড়িতে জামাই এসেছে অনেকদিন পরে। খুব আদরযত্ন শুরু হয়ে গেলো।

ভাল কাপে গরম চা এবং বিরাট প্লেটে বহু রকম মিষ্টি সাজিয়ে শাশুড়ী তাঁর জামাইকে অভ্যর্থনা করলেন। শাশুড়ীঠাকরুণ তারপর ভুলুয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, "তা, বাছা, তোমার সব ভাল তো?"

ভুলুয়া এবার স্মরণ করে নিলো দাদার দ্বিতীয় উপদেশ। শ্বশুরবাড়িতে অপ্রয়োজনে মুখ খুলে সে বোকামির পরিচয় দিচ্ছে না। যথাসম্ভব সমস্ত প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' এবং 'না' দিয়ে সারবে ভুলুয়া।

শাশুড়ীর প্রশ্নের উত্তরে ভুলুয়া বললো, "হ্যাঁ।"

শাশুড়ী এবার জিজ্ঞেস করলেন, "আমার মেয়ে ভাল আছে তো?"

"না।" স্টাইলের মাথায় উত্তর দিলো আমাদের ভুলুয়া।

সেই না শুনে শাশুড়ীর মুখ শুকিয়ে গেলো। উদ্বেগের সঙ্গে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ওর কি অসুখ করেছে?"

আগের প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলেছে, তাই ভুলুয়া এবার নির্দ্বিধায় বলে উঠলো, "হ্যাঁ।"

শাশুড়ীর উদ্বেগ আরও বাড়ছে। দুশ্চিন্তায় তাঁর গলা থরথর করে কাঁপছে। "মেয়ের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে তো?"

"না।" গম্ভীরভাবে শাশুড়ীকে শুনিয়ে দিলো আমাদের ভুলুয়া।

শাশুড়ীর ভীষণ ভয় করছে। জামাই এতো কম কথা বলছে কেন? আসল দুঃসংবাদটা সে নিশ্চয় সইয়ে-সইয়ে ছাড়তে চাইছে। উদ্বেগে শাশুড়ীর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। কাঁদ-কাঁদ হয়ে তিনি

জিজ্ঞেস করলেন, "খুকী কি বেঁচে নেই?"

"হ্যাঁ," ভুলুয়া শান্তভাবেই উত্তর দিলো।

আদরের মেয়ের মৃত্যুসংবাদে শাশুড়ী ভিরমী খেলেন। লোকজন ছুটে এলো, চোখে মুখে অনেকক্ষণ জল ছিটিয়েও তাঁর জ্ঞান আসে না।

অনেকক্ষণ পরে শাশুড়ী চোখ খুললেন। বাড়ির লোকজন জিজ্ঞেস করলো কী হয়েছে? কান্নায় ভেঙে পড়ে তিনি জামাইকে দেখিয়ে দিলেন। "জামাই এইমাত্র খবর এনেছে খুকী আর নেই," এই বলে আবার মূর্ছা গেলেন শাশুড়ী।

শ্বশুরমশায় ততক্ষণে বাড়ি ফিরে এসেছেন। তিনি খুব ফ্যাসাদে পড়ে গেলেন। বললেন, "তা কী করে হবে? কালই তো আমার লোক গিয়েছিল খুকুর কাছে। কাল পর্যন্ত তার তো কোনো অসুখবিসুখ ছিল না।"

শ্বশুর এবার জামাইয়ের দিকে তাকালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "আমার মেয়ে কি সত্যিই মারা গেছে?"

এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে ভুলুয়া উত্তর দিলো, "না!"

হা-হা! হি-হি! হাহা! বোকা জামাইয়ের কাণ্ডকারখানা শুনে শিবাজী, তিলক ও বুলবুলের হাসি থামতেই চায় না। বুলবুল বললো, "ছোটমামা, এ হতেই পারে না। নিশ্চয় বানানো।"

ছোটমামা গম্ভীরভাবে বললেন, "আমাকে বিশ্বাস না হলে চলে যাও উত্তরপ্রদেশের আলমোড়ায়। সেখানকার প্রত্যেকটি গাঁয়ের লোকের কাছে শুনবে, ভুলুয়া বলে এক বোকা ছিল এবং সে এই আলমোড়াতেই থাকতো।"



হা-হা হি-হি — বুলবুল, শিবাজী ও তিলকের হাসি এখনও চলেছে। ছোটমামা সেই সুযোগে ঘড়ি দেখলেন। তিন দিদি এতোক্ষণে নিশ্চয় কেনাকাটা শেষ করে নেমন্তন্নর চিঠি বিলনো আরম্ভ করেছে। বাড়ি ফিরতে আর ঘণ্টাখানেক, ছোটমামা মনে মনে হিসেব করে নিলেন।

"আর হাসি নয়," এবার গম্ভীরভাবে সাবধান করে দিলেন ছোটমামা। "কিছুদিন আগে কেরালার এক গ্রামে একজন লোক হাসতে হাসতে হাঁস হয়ে গিয়েছে। বিশ্বাস না-হলে ত্রিভান্দ্রম হাসপাতালে খোঁজ করে এসো।"

গুরুতর এই অঘটনের কথা শুনে বুলবুল সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেলো।

সুযোগ বুঝে আরও গম্ভীর মুখে মামা বললেন, "গাঁয়ের লোকরা হাঁসটাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ডাক্তাররা জবাব দিয়ে দিলেন — এ-রোগের কোনো চিকিৎসা তাঁদের জানা নেই। লোকগুলো বলেছিল, রোগীকে কয়েকদিনের জন্য অবজার্ভেশনে রাখা হোক। ডাক্তাররা তাতেও রাজী হলেন না — হাসপাতালে হাঁস রাখার নিয়ম নেই।"

শিবাজী বললো, "তা কী করে হয়? হাঁসপাতাল কথাটার মধ্যেই তো হাঁস রয়েছে।"

ছোটমামা বললেন, "গোড়াতেই তোমার ভুল হয়ে যাচ্ছে। কথাটা হাসপাতাল—চন্দ্রবিন্দুর ব্যাপারই নেই। হাসপাতালের সঙ্গে হাঁস অথবা পাতালের কোনো সম্পর্ক নেই। ইংরিজী হসপিটাল কথাটাই বাংলায় হাসপাতাল হয়ে গিয়েছে।"

তিলক বললো, "তাই তো হওয়া উচিত। সায়েবরাই তো এদেশে হসপিটাল নিয়ে আসে—ব্যাপারটা তো আমাদের জানা ছিল না।"

ছোটমামা বললেন, "কথাটা ঠিক হলো না তিলক। পৃথিবীর প্রথম হাসপাতাল এই ভারতবর্ষেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এখন থেকে কয়েকহাজার বছর আগে। বিদেশের পণ্ডিতরাও সে-কথা স্বীকার করেন।"

শিবাজী এবার অনুরোধ করলো, আর একটা গল্প হয়ে যাক।

"আর হাসির গল্প নয় কিন্তু, ছোটমামা," অনুরোধ করলো তিলক।

"কিন্তু তা বলে দুঃখের গল্পও নয়।" বুলবুলের কথা শুনে ছোটমামা বুঝতে পারছেন ছোটরা আজকাল দুঃখের গল্প শুনতে মোটেই ভালবাসে না।

"বেশ, তোমাদের কথাই থাকছে। এবার হাসিরও না কান্নারও না—স্রেফ কাজের গল্প একখানা শুনে নাও। এই ঘটনাটা জোগাড় করেছিলাম রবি মেননের কাছ থেকে। মেননরা কেরলের

নামকরা পরিবার।”

“আমাদের জামশেদপুরেও মেননকাকু আছেন,” বুলবুল বললো। “আমাদের পাশের কোয়ার্টারেই থাকেন।”

“আমাদের ভিলাইতেও মিস্টার মেনন আছেন,” শিবাজী সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলো।

“মেননরা পৃথিবীর সমস্ত দেশে ছড়িয়ে আছেন,” মৃদু হেসে ছোটমামা জানালেন।

ছোটমামা এবার গল্প শুরু করলেন, “সেকালে কেরলে অনেক ছোট ছোট রাজ্য এবং রাজা ছিলেন। এইসব রাজা, তাঁদের রাণী, রাজকন্যা এবং রাজপুত্র নিয়ে যে কত গল্প এখানকার গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে আছে তা তোমাদের কী বলবো।”

“শুধু রাজা থাকলেই চলবে না। রাজার জন্যে হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, সিংহ দরজায় দারোয়ান, মন্ত্রী, কোটাল, পুরোহিত কত কি দরকার। সেই সঙ্গে চাই সেবার জন্য ভৃত্য।”

“ভৃত্য মানে তো সার্ভেন্ট? তাই না ছোটমামা?” বাংলায় ‘উইক’ তিলক জিজ্ঞেস করে নেয়।

“ঠিক বলেছো। সেবক, কর্মচারী, সহকারী, চাকর, নকর, নফর, খাদেম, খিদমৎগার আরও কত মানে হয়,” ছোটমামা বুঝিয়ে দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, “ভৃত্যের উল্টো কী?”

বুলবুল চটপট উত্তর দিলো, “প্রভু।”

“গুড!” তারিফ করে ছোটমামা বললেন, “বুলবুলটা বাংলায় যা স্ট্রং, শেষ পর্যন্ত না আশাপূর্ণা দেবী হয়ে যায়।”

বুলবুলের মুখের দিকে তাকিয়ে ছোটমামা এবার বললেন, "প্রভু ছাড়াও আরও কয়েকটা প্রতিশব্দ হয়—মালিক, মনিব, কর্তা, হুজুর।"

"এবার গল্প শোনো।"—ছোটমামা গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

এক রাজার দুই চাকর—একজনের নাম গণেশন আরেকজন কেশবন।

এরা দু'জনে একই দিনে একই রাজপ্রাসাদে একই পোস্টে চাকরি শুরু করেছিল। কিন্তু গণেশন সেই চাকরই থেকে গিয়েছে আর কেশবন পটাপট উন্নতি করে চলেছে।

কেশবন এখন রাজপ্রাসাদের কেউকেটা। সে জন্যে গণেশনের মনে দুঃখের শেষ নেই। এর থেকে বেশী অবিচার কী হতে পারে? একই দিনে রাজকার্যে যোগ দিয়ে একজন অফিসার হয়ে গেলো, আর একজন এখনও মহারাজের তামাক সেজে মরছে।

অনেকদিন গুমড়ে থেকে গণেশন আর পারলো না। একদিন সুযোগ বুঝে রাজার কাছে নিজের দুঃখের কথা সে প্রকাশ করে ফেললো। "ধর্মাবতার, আমি খুব মনোকষ্টে আছি।"

"কেন কী হলো তোমার?" রাজা প্রশ্ন করলেন।

গণেশন খুব দুঃখের সঙ্গে বললো, "মহারাজ, আমি দিনরাত আপনার সেবা করে চলেছি, আপনার বিশ্বস্ত চাকর আমি। ওই কেশবন, সেও একই দিনে আপনার চাকরিতে ঢুকেছিল। অথচ সে এখন আমার থেকে অনেক বেশী মাইনে পাচ্ছে। আমার কেসটাও, হুজুর, আপনি একটু বিবেচনা করে দেখুন।"

মহারাজা সেদিন খুব খুশমেজাজে ছিলেন। গণেশনের দাবীসনদে তাই চটে উঠলেন না। মিষ্টি হেসে বললেন, "আমি অবশ্যই তোমার কথা বিবেচনা করবো, গণেশন। সুবিচার করাটাই তো আমার কাজ।"

ঠিক সেই সময় রাস্তা দিয়ে একটা গোরুর গাড়ি যাচ্ছিল। বারান্দা থেকে ওই গাড়ি দেখে রাজা বললেন, "বাছা গণেশন, ওই গাড়িতে কে আছে একবার খোঁজ নিয়ে এসো তো।"

গণেশন সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলো এবং কিছুক্ষণ পরেই ছুটতে ছুটতে ফিরে এলো। রাজাকে সেলাম করে সে বললো, "হুজুর, এরা দক্ষিণ দেশ থেকে এসেছে—এদের নাম নারায়ণ আয়ার ও লক্ষ্মী আয়ার। এদের সঙ্গে একজন চাকরও আছে। তার নাম গোপালন।"

রাজা বললেন, "যাও, জেনে এসো ওরা কোথায় যাচ্ছে।"

গণেশন এবার তড়িৎগতিতে ছুটলো এবং মহারাজার হুকুম মতো খবর নিয়ে ফিরে এলো। "ধর্মাবতার, ওরা কোট্টায়ম যাচ্ছে।"

রাজা এবার তামাক খেতে খেতে বললেন, "বাছা গণেশন, আবার যাও এবং জেনে এসো ওরা কেন কোট্টায়ম যাচ্ছে?"

গণেশন আবার ছুটলো এবং নারায়ণ আয়ার কেন সস্ত্রীক কোট্টায়ম যাচ্ছে তা জেনে এলো। "ধর্মাবতার, বিবাহ উপলক্ষে ওরা ওখানে যাচ্ছে।"

রাজা আবার গড়গড়ায় টান দিলেন এবং হুকুম করলেন, "গণেশন, আবার যাও, জেনে এসো কার বিয়ে।"

আবার বেরিয়ে গেলো গণেশন এবং হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলো। "ধর্মাবতার, ওখানে নারায়ণ আয়ারের ছোট ভায়ের বিয়ে।"

রাজা আবার গড়গড়া থেকে ধোঁয়া ছাড়লেন। "বাছা গণেশন, খবর নিয়ে এসো ওরা কবে ফিরবে।"

হুকুম মাত্র আবার ছুটলো গণেশন এবং ফিরে এসে বললো, "হুজুর, সামনের শনিবার ওদের ফিরবার কথা।"

গণেশন যখন এইভাবে ছোটাছুটি করছে কেশবন তখন রাজপ্রাসাদে ছিল না, বিশেষ কোনো কাজে বাইরে গিয়েছিল। কাজ শেষ করে কিছুক্ষণ পরে সে রাজার কাছে ফিরে এলো।

রাজাসায়েব তখনও বারান্দায় বসে একমনে তামাক টানছিলেন। ঠিক সেই সময় আর একখানা গোরুর গাড়িকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখা গেলো।

রাজাসায়েব এবার কেশবনকে বললেন, "ওই গাড়িতে কে আছে একবার খোঁজ নিয়ে এসো তো।"

কেশবন যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন গণেশনকেও ডাকলেন রাজাসায়েব এবং বললেন, "তুমি এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকো।"

কেশবন ততক্ষণে রাস্তা দিয়ে ছুটছে। গোরুর গাড়ি থামিয়ে, খবর নিয়ে সে যথাসময়ে ফিরে এলো।

গড়গড়ার নলটা নাচাতে-নাচাতে মহারাজা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা কারা?"

সেলাম ঠুকে কেশবন উত্তর দিলো, "মহারাজ, ওরা আতুর থেকে আসছে। যাত্রীদের নাম খাদির এবং তার ছেলে আবদুল।"

মৃদু হেসে রাজাসায়েব বললেন, "আবার গিয়ে ওদের জিজ্ঞেস করো ওরা কোথায় যাচ্ছে ?"

মাথা নিচু করে কুর্নিশ জানিয়ে কেশবন উত্তর দিলো, "মহারাজ, আমি সে খবর আগেই নিয়ে এসেছি। ওরা কুইলন যাচ্ছে।"

মহারাজ হুকুম করলেন, "কেশবন, আবার যাও, জেনে এসো কেন ওরা কুইলন যাচ্ছে ?"

"মহারাজ, সে খবরও এই বান্দা নিয়ে এসেছে। শুনলাম, রাজদরবারে ওদের মামলা আছে।"

"ওদের মামলা তা কি জানা সম্ভব কেশবন ?" মহারাজ গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলেন।

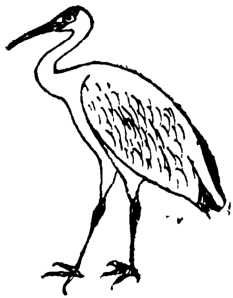
"হ্যাঁ, হুজুর," কেশবন এবার উত্তর দিলেন। "বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে মামলা—তিন হাজার টাকা নিয়ে হাঙ্গামা। একটা লোক, নাম তার সিরাজুদ্দিন—সে তিন বছর আগে থাঁদের কাছ থেকে তিন হাজার টাকা ধার নিয়েছিল, কিন্তু এখনও ফেরত দেয় নি।"

গড়গড়ার নলটা ডানহাতে ধরে রাজাসায়েব এবার গণেশনের দিকে তাকালেন। বললেন, "গণেশন, এবার বোধহয় বুঝতে পারছো কেশবন কেন তোমার থেকে বেশী টাকা পায় ? আমি যা-যা জানতে চেয়েছি তার উত্তর দেবার জন্যে তোমাকে পাঁচ পাঁচবার ছুটতে হলো, আর কেশবন মাত্র একবারেই তোমার থেকে বেশী খবর নিয়ে চলে এলো।"

গণেশন নিজের চোখেই ব্যাপারটা দেখেছে—তাই এখন সে চুপ করে রইলো।

ছোটমামাও এবার চুপ করলেন এবং ভাগ্না-ভাগ্নীদের জিজ্ঞেস করলেন, "কী বুঝলে?"

শিবাজী বললো, "বুঝেছি মামা। শুধু গতর খাটালেই হবে না, তার সঙ্গে মাথাও খাটাতে হবে—নইলে লাইফে উন্নতি করা যাবে না!"



ছোটমামা আড়চোখে আবার ঘড়ির দিকে তাকালেন। এক একটা গল্প হুড়হুড় করে শেষ হয়ে যাচ্ছে অথচ ঘড়িটা কিছুতেই এগোচ্ছে না। তিলক, শিবাজী ও বুলবুলের মায়েদের বাড়ি ফিরতে এখনও অনেক দেরি। এতোক্ষণে তারা হয়তো হাওড়া শিবপুরের নেমন্তন্নগুলো সেরে বড়জোর শালকে হাজির হয়েছে।

গল্পের আসর জমিয়ে রাখবার জন্যে ছোটমামা এবার অন্য বুদ্ধি আঁটলেন। বললেন, "এক তরফা কোনো জিনিসই ভাল নয়। আমি তো গোটাকয়েক গল্প শুনিয়েছি—এবার তোমরা কিছু বলো।"

দুই দুষ্টু ভাগ্নে এবারে চুপ! বুলবুলের মুখ দিয়েও কথা বেরুচ্ছে না! গল্প শোনা খুব সহজ, কিন্তু গল্প বলার যে হাজার হাঙ্গামা তা বুলবুল আন্দাজ করতে পারছে।

ছোটমামা কিন্তু সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনি বললেন, "এবারে আমার তিনটে আঙুল এগিয়ে দিচ্ছি—তোমরা তিনজনে ধরো। এর মধ্যে একটা আঙুলকে গল্পবলা

আঙুল বলে গোপনে ঠিক করে রাখছি। যে সেই আঙুল ধরবে তাকেই গল্প বলতে হবে।"

তিলক, শিবাজী ও বুলবুলের বেশ ভয়-ভয় করছে। কিন্তু উপায় নেই। ভাগ্যে যা উঠবে তা মেনে নিতেই হবে।

ছোটমামা বললেন, "লটারির আগে জিজ্ঞেস করি, পাঁচ আঙুলের পাঁচ নাম তোমরা জানো তো?"

বুলবুল বলে উঠলো, "ইয়েস। আমাদের ইস্কুলের অরুণা দিদিমণি শিখিয়ে দিয়েছেন—কড়ে আঙুলের নাম কনিষ্ঠা। তারপর—অনামিকা, মধ্যমা, তর্জনি ও অঙ্গুষ্ঠ।"

খুব খুশী হলেন ছোটমামা। এমন শক্ত প্রশ্নের উত্তর যে বুলবুল এতো সহজে দিতে পারবে তা তিনি ভাবেন নি। ছোটমামা এবারে অ্যানাউন্স করলেন, "লটারিটা হবে অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনির ভিতর।" ওই তিনটে আঙুল কয়েক সেকেণ্ড কপালে ঠেকিয়ে রেখে ওদের দিকে এগিয়ে দিলেন ছোটমামা।

ওরা তিনজনে মামার তিন আঙুল ধরলো। ছোটমামা সঙ্গে সঙ্গে ফলাফল ঘোষণা করলেন: "তিলক, তুমি ধরেছো মধ্যমা—তোমাকেই গল্প বলতে হবে।"

বেশ ফ্যাসাদে পড়ে গেলো তিলক। কী গল্প বলবে সে ভেবেই পাচ্ছে না।

ছোটমামা উৎসাহ দিলেন, "কাম অন, তিলক। তুমি একটাও সেকালের গল্প জানো না হতেই পারে না।"

তিলক দু' মিনিট ভেবে নিলো। তারপর বললো, "বলছি।

কিন্তু এ-গল্প আমার নিজের নয়।”

“নিজের বানানো গল্প কে শুনতে চাইছে? আমরা চাইছি চিরকালের গল্প—যা সেই আদ্যিকাল থেকে লোকের মুখে-মুখে ঘুরছে এবং এখনও বেঁচে রয়েছে।” শিবাজী এবার সাহস দিলো তিলককে।

“আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করছে।” তিলকের বাঁ হাতের সঙ্গে ডান হাত ঘষা দেখেই ছোটমামা বুঝলেন এটা নার্ভাস হওয়ার লক্ষণ।

“গল্প ইজ গল্প,” বললেন ছোটমামা। “আগেকার লোকেরা যেসব কাণ্ড করে গিয়েছেন তাই গল্প হয়ে বেচে রয়েছে—এসব ব্যাপারে আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই। তাঁরা যা করে গিয়েছেন তা বলতে আমাদের লজ্জা কী?”

তিলক বললো, “একবার আমরা রাজস্থানে গিয়েছিলাম। জয়পুরে আমরা ধর্মশালায় উঠেছিলাম।”

শিবাজী জিজ্ঞেস করলো, “হোয়াট ইজ ধর্মশালা? যেখানে ধর্মটর্ম হয়? মন্দির?”

“দূর!” তিলক রেগে উঠলো, “ধর্মশালা ইজ লাইক হোটেল! খুব কম ভাড়ায় চমৎকার থাকা যায়।”

মামা বললেন,“কথাটার মানে: ধর্মের জন্যে অন্নাদি-দানশালা: তীর্থযাত্রীদের ধর্মকর্মে সুবিধের জন্যে ধনীরা এইসব ধর্মশালা তৈরি করেন। সেকালে আদালতকেও ধর্মশালা বলা হতো।”

তিলক আবার গল্প আরম্ভ করলো: “আমরা যে ধর্মশালায়

উঠেছিলাম সেখানকার দারোয়ানজীর নাম ছিল ভীম সিং। অমন বিরাট গোঁফ আমি কখনও দেখিনি—বাঁদিক থেকে ডানদিক প্রায় এক ফুট।”

“ভারি—ফুট গজ এখন আর চলে না, আইন করে বন্ধ।” বলে উঠলো শিবাজী।

“মানে প্রায় তিরিশ সেন্টিমিটার।” হিসেব করে বলে দিলেন ছোট মামা।

তিলক আরম্ভ করলো, “ভীম সিংজীর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। তিনিই আমাকে একটা রাজস্থানী গল্প শুনিয়েছিলেন—

রাজস্থান মানেই আমাদের মনে পড়ে শেঠজীদের। কিন্তু শেঠজী ছাড়াও আরও কত মানুষ রয়েছে রাজস্থানে—নিজের চোখে না-দেখলে বিশ্বাসই হয় না। এতো সুন্দর দৃশ্য, এমন চমৎকার দুর্গ, প্রাসাদ, স্তম্ভ, ইতিহাসের এমন জীবন্ত প্রভাব, এতো গল্পগাথা গান খুব কম দেশেই আছে।

তিলক বললো, “শেঠজী মানেই হাজার হাজার লাখ-লাখ টাকা, কিন্তু রাজস্থানে দেখলাম সাধারণ লোক, গরীব লোক এবং ভাল লোক অনেক। এইসব লোকের আবার শেঠজীদের ওপর বেশ রাগ।

আমাদের ধর্মশালার দারোয়ান ভীম সিং বলেছিলেন, “বড়লোক শেঠজীরা সুযোগ পেলেই সাধারণ লোকদের ঠকিয়ে এসেছেন চিরকাল। এঁদের হাতে ঠকবার অজস্র গল্প রাজস্থানের

যে কোনো গাঁয়ে গেলেই শুনতে পাওয়া যাবে। যেমন এই ভোলারামের গল্প।”

“ভোলারামটি কে ?” জিজ্ঞেস করে বুলবুল।

“ভোলারাম একজন গ্রামের চাষী। বেশীরভাগ গাঁয়ের লোক যেমন হয়—সহজ, সরল, মাথায় তেমন প্যাঁচালো বুদ্ধি নেই, মিথ্যে কথা বলতে সাহস পায় না, যা কথা দেয় তা কখনও খেলাপ করে না।

ভোলারাম নিজের জমিতে চাষ করে। অনেক খেটে ক্ষেত থেকে ভোলারাম সোনার ফসল তোলে। সুখের সংসার ভোলারামের। বউ, ছেলে, ছেলের বউ এবং নাতি নিয়ে দিন কাটে। মাত্র কিছুদিন আগে এই নাতিটি হওয়ায় ভোলারামের এখন মেজাজ খুব ভাল।

সহজ মানুষ ভোলারাম—তেমন কোনো চাহিদা নেই, চাষ আবাদ থেকে খাওয়াদাওয়া মোটামুটি ভালভাবেই চলে যায়। শুধু কিছু নগদ টাকা পেলে ভোলারাম শহর থেকে নাতির জন্যে কয়েকটা স্পেশাল জামা এবং খেলনা কিনে আনতো।

কয়েকমাস ধরে ভোলারাম ক্ষেতে অনেক কাজ করেছে এবং ভগবানের দয়ায় সেবার ভাল ফসলও তুলেছে গোলায়। এখন গ্রীষ্ম এসেছে, রোদে মাটি ফুটিফাটা হতে শুরু করেছে। ভোলারাম দেখলো উঠোনে বেশ কিছু বিচুলি জমা হয়ে রয়েছে—বাড়ির সবক'টা গোরুর জন্যে যথেষ্ট রেখেও কিছু বাড়তি হবে এবং এখন বেচতে পারলে হয়তো কিছু দামও পাওয়া যাবে।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। ভোলারাম তার গোরুর গাড়ি বের করলো। সোনার বিচুলিতে বোঝাই হলো সেই গাড়ি, তারপর বলদ দুটো জুড়ে দিয়ে, নাতির গালে চুমু খেয়ে ভোলারাম চললো শহরের দিকে।

শহরটা বেশ কিছু দূরে, কিন্তু যা-কিছু বেচাকেনা ওই গঞ্জেই —গ্রামের লোক সবাই ওই মণ্ডিতেই চলে আসে তাদের মাল বেচতে।

মণ্ডির খুব কাছাকাছি চলে এসেছে ভোলারাম, এমন সময় পথে এক শেঠজীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। মাথায় বিরাট পাগড়ি এবং পেটে যত রাজ্যের দুষ্টুবুদ্ধি এই শেঠজীর।

দূর থেকে বিচুলি বোঝাই গাড়ি দেখেই শেঠজীর মাথায় লোক ঠকানোর নেশা চেপে গেলো। গোরুর গাড়ি থামিয়ে শেঠজী জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী?"

"আমার নাম ভোলারাম।"

ভোলারাম! শেঠজী মনে মনে ভাবলেন ভোলারাম মানে তো যে ভুলে যায়, তার মানে খুব বোকা হবে নিশ্চয়।

বিচুলির ডাঁই আর একবার দেখে নিলেন শেঠজী। "বেশ ভাল বিচুলিই তো মনে হচ্ছে—তা গাড়ির দাম কতো?"

ভোলারাম সত্যিই সরল। সে ভাবলো শেঠজী জিজ্ঞেস করছেন এক গাড়ি বিচুলির দাম কতো। সে বললো, "গাড়ি পাঁচ টাকা।"

"বড্ড বেশী দাম বলছো তুমি।" দাম কমাবার চেষ্টায় বিরক্তি

প্রকাশ করলেন শেঠজী এবং এমন ভাব দেখিয়ে ছাতাবগলে হাঁটতে লাগলেন যার মানে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। ভোলারামও বলদ জোড়াকে হ্যাট-হ্যাট করে গাড়ি ছেড়ে দিলো।

গাড়ি চলছে সেই সময় শেঠজী আবার ফিরে এলেন। মুখ ব্যাজার করে বললেন, "খুবই চড়া দাম হাঁকছো—তবু কী আর করা যাবে, তোমার দামেই রাজী হলাম। গাড়ি নিয়ে চলো আমার বাড়ি।"

শেঠজীর পিছন-পিছন ভোলারামের গাড়ি চললো। নিজের বাড়ির কাছে এসে উঠোন দেখিয়ে দিলেন শেঠজী। ভোলারাম সেখানেই খড়গুলো নামিয়ে দিলো।

শেঠজী এবার পাগড়ির ভাঁজ থেকে পাঁচটি টাকা বার করে দিলেন এবং ভোলারাম টাকাগুলো খুব সাবধানে নিজের পাগড়িতে গুঁজে নিলো।

এবার ভোলারাম খালি গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে রাস্তায় বেরোতে যাচ্ছে। এমন সময় শেঠজী হাঁ-হাঁ করে ছুটে এসে রাস্তা আটকে দাঁড়ালেন। "করো কী? করো কী? ভোলারাম, তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়! তুমি আমার গাড়ি নিয়ে কেটে পড়ছো! তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, গাড়ির দাম কতো—তার মানে শুধু বিচুলি নয়, পুরো গাড়িটা এবং বলদ জোড়া।"

ভোলারাম তো মাথায় হাত দিয়ে রাস্তায় বসে পড়লো। "আপনি কী বলছেন শেঠজী? আমি পাঁচ টাকায় এই গাড়ি এবং বলদ বিক্রি করতে যাবো কোন দুঃখে?"

কিন্তু শেঠজী নরম হবার পাত্র নন। ভোলারাম এবার নিরুপায় হয়ে শেঠজীর পা দুটো জড়িয়ে ধরলো। কিন্তু শেঠজী ভারিক্কি চালে রেগেমেগে পা দুটো ছাড়িয়ে নিলেন।

পাগড়িতে একবার হাত দিয়ে শেঠজী বললেন, "এখন কাঁদলে কী হবে? অস্বীকার করতে পারো যে তুমি বলোনি গাড়ির দাম পাঁচ টাকা?"

"যা বলেছি তা কেন আমি অস্বীকার করতে যাবো? কিন্তু শেঠজী, আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা হলো গাড়িতে যে খড় আছে তার দাম পাঁচ টাকা।"

"তুমি যা বলতে চেয়েছিলে তা নিয়ে আমার মোটেই মাথা ব্যথা নেই—তুমি কী বলেছো সেটাই একমাত্র কথা। আমার সময় আর নষ্ট কোরো না, গাড়িটা এখানে রেখে তুমি সুড়সুড় করে কেটে পড়ো।" শেঠজী এবার অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন।

বেচারা ভোলারাম কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। কথার মারপ্যাঁচে সে যে ঠকে গিয়েছে তা বুঝতে পেরেছে ভোলারাম। মুখ অন্ধকার করে তাকে বাড়ি ফিরে আসতে হলো।

ভোলারামের ছেলে বাড়িতে বসেছিল। বাবার মুখ দেখেই সে বুঝেছে কোনো বিপদ হয়েছে। শেঠজীর জোচ্চুরির ব্যাপারটা শুনে ছেলে ভীষণ রেগে উঠলো।

রাগে গরগর করতে করতে ভোলারামের ছেলে বললো, "চিত মে হাথ মে খোট—বুকে এবং হাতে জোচ্চুরি, এই হচ্ছে শেঠজী। এর বদলা নিতেই হবে। শেঠজীকে আমি এমন শিক্ষা

দেবো যে ভবিষ্যতে কোনো সরল লোককে ঠকাবার আগে তাকে পাঁচবার ভাবতে হবে।”

পরের দিন সকালে ভোলারামের ছেলে পাশের বাড়ির চাচার কাছ থেকে একটা গোরুর গাড়ি ধার করে আনলো। চমৎকার খড়ে গাড়িটা সে বোঝাই করে নিলো। তারপর বাবাকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লো শহরের পথে।

বাবা যে-পথে মণ্ডিতে গিয়েছিলেন সেই পথ ধরেই ছেলের গাড়ি চলেছে। গাড়ি চলেছে তো চলেছেই।

মণ্ডি আর বেশী দূর নয়। চারদিকে সতর্ক নজর রেখেছে ভোলারামের ছেলে। দূর থেকে এবার যেন একজন শেঠজীকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, চেহারাটা বাবা যেমন বলেছিলেন তেমনই মনে হচ্ছে। নিশ্চয় এই লোকটাই সেই জোচ্চোর।

ভোলারামের ছেলে যা ভেবেছে তাই! শেঠজী গাড়ি থামালেন। খড়গুলো দেখে বললেন, “বাঃ, বেশ ভাল খড়ই মনে হচ্ছে। তা এ-গাড়ির দাম কতো?”

এই সুযোগটার জন্যেই ভোলারামের ছেলে অপেক্ষা করছিল। সে সরলভাবে বললো, “শেঠজী আপনাকে সত্যি কথা বলছি, এবারে প্রচুর খড় হয়েছে। গাঁয়ে খড় রাখার জায়গা নেই। আপনার কাছে কী দাম চাইবো?”

শেঠজী বললেন, “না না। একটা কিছু দাম তো বলতেই হবে।”

ভোলারামের ছেলে মাথা চুলকে জিজ্ঞেস করলো, “বাড়িতে

ছোট ছেলে আছে?"

"অবশ্যই। আমার নিজের ছেলে রয়েছে।" শেঠজী উত্তর দিলেন।

"তাহলে তার পয়সার মুঠো পেলেই আমি সন্তুষ্ট।" ভোলারামের ছেলে জানিয়ে দিলো।

মাত্র একমুঠো পয়সা! তাও ওই ছোট্ট হাতের মুঠোয়! বিশ্বাসই হচ্ছে না শেঠজীর। মনে মনে অনেক হিসেব করে ফেললেন শেঠজী। ঠিক করলেন, মুঠোর মধ্যে সিকি আধুলি দেবেন না —স্রেফ পয়সা। তাহলে আর ক'টা পয়সাই বা লাগছে! তবু নিঃসন্দেহ হবার জন্যে শেঠজী আবার জিজ্ঞেস করলেন, "ঠিক তো? পয়সার মুঠো পেলেই তুমি সন্তুষ্ট হবে?"

"আমরা এক কথার মানুষ, শেঠজী। যা জবান দিই তা রক্ষে করি," সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো ভোলারামের ছেলে।

শেঠজীর বুকের ভিতরটা আনন্দে গুড়গুড় করতে লাগলো। আজ তা হলে বেশ দাঁও মারা গিয়েছে—প্রায় নিখরচায় একজোড়া বলদ, একখানা গাড়ি এবং গাড়ি-বোঝাই খড় ম্যানেজ করা গেলো।

ভোলারামের গাড়ি শেঠজীর পিছন পিছন তাঁর বাড়ির উঠোনে হাজির হলো। কোথায় খড় নামাতে হবে দেখিয়ে দিয়ে শেঠজী ভিতরে চলে গেলেন, বোধ হয় তাঁর খোকাকে আনতে।

ভোলারামের ছেলে দেখলো উঠোনে বেশ কিছু খড় পড়ে রয়েছে। একটু দূরেই একখানা গাড়ি এবং একজোড়া বলদ

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এদের চিনতে একটুও দেরি হলো না ভোলারামের ছেলের।

খড় নামানো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেঠজী তাঁর ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে ফিরে এলেন।

খুবই খুশ মেজাজে রয়েছেন শেঠজী। ছেলের হাতটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এই নাও তোমার দাম।"

ভোলারামের ছেলে এই সুযোগের জন্মেই অপেক্ষা করছিল। ছেলের হাতটা ধরে সে ফস করে পকেট থেকে একখানা ধারালো ছুরি বার করে ফেললো।

"শেঠজী, আপনার মনে আছে নিশ্চয়, আমি বলেছিলাম পয়সার মুঠো।"

"হ্যাঁ, তাইতো বলেছিলেন," উত্তর দিলেন শেঠজী। ছুরিটা দেখে একটু অস্বস্তি বোধ করছেন শেঠজী।

"তার মানে শুধু পয়সাগুলো নয়, আপনার ছেলের মুঠোটাও আমার পাওনা," এই বলে ভোলারামের ছেলে এমনভাবে ছুরিটা নাড়াতে লাগলো যেন এখনই সে হাতটা কেটে ফেলবে।

"এসব কী দুষ্টুমি হচ্ছে।" রাগে চিৎকার করে উঠলেন শেঠজী।

"দুষ্টুমি! আমি তো কোনো দুষ্টুমি করছি না," ভোলারামের ছেলে এবার অম্লান বদনে উত্তর দিলো।

"পয়সার মুঠো বলতে পয়সাগুলোই বোঝায়, হাতের মুঠোটা তার সঙ্গে দেবার কথা ওঠে না।" শেঠজী এবার বেশ জোরে বলে উঠলেন।

"কে বলেছে ?" ভোলারামের ছেলেও এবার মেজাজ দেখালো।

"আমি বলছি।" উত্তর দিলেন শেঠজী।

"আজে-বাজে বললে তো চলবে না। আপনি যা বলছেন তা যদি ঠিক হয়, তাহলে এক গাড়ি খড় বলতে খড়ের সঙ্গে গাড়ি এবং বলদ বোঝায় কী করে ?"

শেঠজী এবার নিজের ফাঁদে নিজে ধরা পড়ে ঘামতে শুরু করেছেন। হাতজোড় করে বললেন, "আমার ভুল হয়ে গিয়েছে, আমাকে ক্ষমা করুন।"

"আমি কোন দুঃখে ক্ষমা করতে যাবো ? আমার বাবা যখন আপনার পায়ে ধরে মিনতি করেছিলেন তখন তো আপনি তাঁর দিকে তাকিয়েও দেখেননি। এখন কেন আবার ক্ষমা চাইছেন ? আমার পয়সাও চাই, আপনার ছেলের মুঠোও চাই।"

শেঠজীর এখন শোচনীয় অবস্থা। বিশ্বাস নেই লোকটাকে, এবার সত্যিই হয়তো একমাত্র ছেলের হাতটা কেটে নেবে।

শেঠজী কাতরভাবে বললেন, "আপনার বাবার গাড়িটা ফেরত দিচ্ছি এখনই। টাকার ওপর আমার একটুও মায়া নেই। আপনি যা চাইবেন তাই দেবো, দয়া করে আমার ছেলের হাতটা কেটে নেবেন না।"

মুচকি হেসে ভোলারামের ছেলে বললো, "এতোই দিলদার লোক যখন আপনি তখন নিশ্চয় হাজার টাকা দিতে কষ্ট পাবেন না।"

হাজার টাকা! বুক ভেঙে যাচ্ছে শেঠজীর। কিন্তু কোনো উপায় নেই—এমন ফাঁদে তিনি কখনও পড়েন নি।

শেঠজী ছুটে ভিতরে গিয়ে ক্যাশবাক্স থেকে হাজার টাকা নিয়ে এলেন।

ভোলারামের ছেলে বললো, "আপনার ওই নোংরা হাত থেকে টাকা নিচ্ছি না আমি। মাথার পাগড়ি নামিয়ে ওর ভিতরে হাজার টাকা রেখে আমার দিকে এগিয়ে দিন।"

পাগড়ি খোলা শেঠজীদের পক্ষে খুব অপমান। কিন্তু কোনো উপায় নেই। পাগড়ির মধ্যেই টাকা পুরে ভোলারামের ছেলের পায়ের কাছে রাখলেন তিনি।

"যেমন দেবে তেমন পাবে," এই বলে ভোলারামের ছেলে শেঠজীকে ভবিষ্যতে লোক ঠকাতে মানা করলো।

শেঠজী ততক্ষণে আদরের ছেলেকে কোলে করে বাড়ির মধ্যে পালিয়েছেন।

হাজার টাকা ট্যাঁকে গুঁজে, দু'খানা গোরুর গাড়ি নিয়ে ভোলারামের ছেলে এবার বাবাকে সুখবরটা দেবার জন্যে গ্রামের দিকে ফিরে চললো।

গল্প শেষ করে তিলক এবার রুমালে নাকের ঘাম মুছে নিলো।

বুলবুল বললো, "তিলকদা, খুব ভাল হয়েছে। দুষ্টু শেঠজী যদি এইভাবে জব্দ না হতো তাহলে কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগতো।"

শিবাজী বললো, "একেই বলে টিট ফর ট্যাট—য্যায়সা কে ত্যায়সা।"

ছোটমামাও খুশী। তিলকের পিঠ চাপড়ে তিনি বললেন, "ওয়েল ডান!"



"একজন অতি চালাক শেঠজীর গল্প যখন তোমরা মজা করে শুনলে, তখন আর একজন শেঠের কাহিনী শোনাতে লোভ হচ্ছে।"

মামার এই কথা শুনে তিলক, শিবাজী, বুলবুল আনন্দে হৈ-হৈ করে উঠলো।

"একজন শেঠে আমাদের মন ভরে নি, ছোটমামা," বলে উঠলো শিবাজী।

বুলবুল জিজ্ঞেস করলো, "ছোটমামা, তোমার শেঠজী কোথাকার লোক ?"

ছোটমামা বললেন, "ইনিও রাজস্থানের। বিড়লাই বলো, ডালমিয়াই বলো, গোয়েঙ্কাই বলো সব বড় বড় শেঠের দেশ হলো এই রাজস্থান। মাড়ওয়ার থেকে এসেছেন বলে ওঁদের বলা হয় মাড়ওয়ারী।"

ছোটমামা মৃদু হেসে বললেন, "আমার শেঠজী কিন্তু এখনকার লোক নন—অনেক অনেকদিন আগে তিনি যখন ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন তখন রাজস্থানে রাণাদের রাজত্ব।"

"ওঃ। রাণাদের আমার খুব ভাল লাগে। পাঠান মোগলদের

সঙ্গে ওঁরা যা ফাইট দিয়েছেন! বীর বলতে রাজস্থানের রাণাদেরই বোঝায়," বলে উঠলো শিবাজী।

"আর চতুর বলতে বোঝায় শেঠজীদের। টাকা-আনা-পাইয়ের বুদ্ধিতে এঁদের সঙ্গে পেরে ওঠা রাজাদেরও সাধ্য নয়। তাই শ্রেষ্ঠীদের শক্তির কাছে রাজারা অনেক সময় মার খেয়েছেন," ছোটমামা বুঝিয়ে বললেন।

"স্টার্ট ইওর গল্প মামা," শেঠজীর কাণ্ডকারখানা শোনবার জন্যে শিবাজী উৎসুক হয়ে উঠেছে।

মামা শুরু করলেন :

আমাদের এই শেঠজীর বিরাট বাড়ি, বিরাট ব্যবসা, প্রচুর টাকা পয়সা। কিন্তু শেঠানীর, অর্থাৎ শেঠজীর বউয়ের মনে সুখ নেই।

শেঠজী সেই সকালে বেরিয়ে যান, আর ফেরেন অনেক রাত করে। শেঠানী বহু বলে বলেও শেঠজীর বাইরে থাকার সময় কমাতে পারেন নি।

শেঠানী মাঝে মাঝে খুব অভিমান করেন। ব্যস্ত শেঠজী তখন তাঁর নানা কাজের লম্বা ফিরিস্তি দেন। "গিন্নী, জানোই তো বিরাট ব্যবসা আমার। বড় ব্যবসা মানেই হাজার রকমের হাঙ্গামা। সকালে সেই যে গদিতে বসি তারপর থেকে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পাই না।"

শেঠানীর সন্দেহ মিটছে না। তাই তিনি স্বামীকে জেরা করলেন, "সন্ধ্যেবেলাতেও তোমার কাজ?"

শেঠজী বললেন, "সন্ধ্যেবেলাতেই তো যত রাজ্যের মিটিং। তোমার স্বামী তো অর্ডিনারি শেঠ নয়, সুতরাং বড় বড় বিজনেস মিটিংয়ে তাকে উপস্থিত থাকতেই হয়।"

"মিটিঙের পর কী করো?" জানতে চাইলেন শেঠ গিন্নী।

"মিটিং-এর পরেও রেহাই নেই। কত বন্ধুবান্ধব আমার সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে আসে। কত লোকের কত সমস্যা—আমার উপদেশ ছাড়া কেউ এক পা নড়বে না।" এইবার গর্বে গোঁফ নাচালেন শেঠজী।

শেঠানী বুঝলেন শেঠজী এবার কোনো চাঞ্চল্যকর খবর দেবেন। শেঠজী ফিসফিস করে বললেন, "গিন্নী, জেনে রাখো তেমন প্রয়োজনে স্বয়ং রাণা এই অধমের সঙ্গে পরামর্শ করেন।"

কী আর করবেন শেঠানী? স্বামীকে বাগে আনতে না-পেরে মুখ গোমড়া করে বসে রইলেন।

শেঠজী বললেন, "মুখ গোমড়া হবার মতো কিছু তো করিনি। তোমার কোনো অভাব রেখেছি? টাকাকড়ি দাসদাসী কোনো কিছুর অভাব আছে তোমার? যত খুশী দাসী বাঁদীদের হুকুম করো, টাকা খরচ করো, খাওদাও। যখন-ইচ্ছে স্যাকরাকে ডেকে পাঠাও—মনের মতন গয়না গড়াও।"

গয়নার কথা ওঠায় শেঠানীর মুখ বন্ধ হলো, কারণ গয়নাতে তাঁর বেশ লোভ। এবার প্রচুর হীরে জহরত কিনে দিয়েছেন শেঠজী।

সেদিন ছিল গৌরী দেবীর পূজো। সংসারে যা-কিছু ধন-দৌলত তা এই দেবীরই দয়ায়—তাই পূজোর দিনে ভক্তের দল এক মনে দেবীর মন জয়ের জন্যে উঠে পড়ে লাগেন।

শেঠজী অনেক রাত পর্যন্ত এই উৎসবে মেতে থাকলেন। অন্য অনেক শেঠজীর সঙ্গে ওঁর দেখা-সাক্ষাৎ করতে হলো। শেঠজীর প্রচণ্ড খাতির, যেখানেই যান লোকে ছাড়ে না, কিছুক্ষণ বসতে হয়। এইভাবে কখন যে অনেক রাত হয়ে গিয়েছে তা শেঠজীর খেয়াল হয়নি। হঠাৎ বাইরের দিকে তাকিয়ে শেঠজী বুঝলেন মাঝরাত পেরিয়েছে।

শেঠজীর এক বন্ধুর বাড়িতে তখন আমোদ-আহ্লাদ হচ্ছিল। তিনি বললেন, "শহরের রাস্তাটা ভাল নয়—রাতও হয়েছে অনেক। তোমাকে এইভাবে ছাড়ছি না। আমার এই ঘোড়াটা চড়ে বাড়ি ফিরে যাও।"

বন্ধুর কথামতো ঘোড়ার পিঠে চড়েই রাতের অন্ধকারে শেঠজী বেরিয়ে পড়লেন। পথ জনহীন, কোথাও কোনো কোলাহল নেই। একটু আলো দেখা যাচ্ছে না—শেঠজীর ঘোড়া ছুটতে লাগলো। পথটা সত্যিই ভাল নয়—এ-অঞ্চলে প্রায়ই চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই হয়।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে যেতে যেতে দূর থেকে শেঠজী দেখলেন একটা মানুষ যেন পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোর ডাকাত এইভাবে পথ আগলাতে পারে—সুতরাং কোনোরকম ঝুঁকি নেবেন না শেঠজী। একবার থামলেই বিপদ। শেঠজী ঘোড়াসহই ধাক্কা

মেরে এগিয়ে যাবেন—এছাড়া মাঝ রাতে প্রাণ রক্ষার অন্য কোনো উপায় নেই।

শেঠজীর ঘোড়া তীব্র বেগে ছুটে চললো, ধাক্কা মারলো লোকটাকে এবং কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সমান বেগে এগিয়ে চললো।

বেশ কিছুটা এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন শেঠজী। বিপদ কেটে গিয়েছে, কিন্তু এখন মাথায় অন্য চিন্তা আসছে। ঘোড়ার ধাক্কা খেয়ে লোকটার কী হলো তা একবার দেখা প্রয়োজন।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন শেঠজী—ঘোড়া এবার ছুটতে লাগলো উল্টোদিকে।

শেঠজী দেখলেন অন্ধকার রাজপথে লোকটা তখনও মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে শেঠজী লোকটাকে তুললেন। মাথায় ঘোড়ার লাথি খেয়ে লোকটার সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে।

এবার কিন্তু শেঠজীর রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এলো। চোর ডাকাত নয়—এ যে রাণার ছোট ছেলে! স্বয়ং রাজপুত্র খুন হয়েছেন শেঠজীর ঘোড়ার আক্রমণে! আর ভাবতে পারছেন না শেঠজী—এর পরিণাম যে ফাঁসি তা মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন তিনি।

হে ঈশ্বর, এখন কী কর্তব্য? এতোদিন কতো লোককে বিপদ থেকে বেরিয়ে আসবার পরামর্শ দিয়েছি আমি, কিন্তু এখন কে আমাকে বাঁচবার পথ দেখাবে?

রাজকুমারের মৃতদেহটা কাঁধে নিয়ে শেঠজী আবার ঘোড়ায় চড়লেন।

কিছুদূর গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে একটা সরু গলিতে ঢুকে পড়লেন শেঠজী। ভাগ্যে রাস্তায় এখন কেউ নেই। চুপি চুপি একটা দেশী মদের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালেন শেঠজী।

দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। এই দোকানে নিয়মিত মদ খেতে আসতেন ছোটরাজকুমার। প্রায়ই মাতাল হবার বদনাম আছে এই রাজপুত্রের। দরজায় ঠেকা দিয়ে কোনোরকমে দেহটা দাঁড় করালেন শেঠজী, তারপর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এলেন তিনি।

এবার ঘোড়া ছুটিয়ে সোজা বাড়ি হাজির হলেন শেঠজী। ঘরের মধ্যে ঢুকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

একটিও কথা নয়। সটান বিছানায় শুয়ে পড়লেন শেঠজী। কিছুক্ষণ আগেকার ঘটনাটা ঘরের মধ্যেও কোনোক্রমে ভুলতে চান তিনি।

এরপর এক ঘণ্টাও কাটেনি। সবে একটু ঘুমের ঘোর এসেছে শেঠজীর। এমন সময় দরজায় টোকা পড়তে শুরু করলো। কেউ খুব ভয় পেয়ে চাপা গলায় ডাকছে, "শেঠজী শেঠজী, দয়া করে দরজা খুলুন।"

বিছানা থেকে না-উঠে খুব রেগেমেগে শেঠজী বললেন, "দেখা করবার আর সময় পেলে না? এত রাত্রে কেউ কারও সঙ্গে দেখা করে?"

লোকটা করুণভাবে বললো, "আমাকে ক্ষমা করুন শেঠজী। ভীষণ বিপদ আমার। না-হলে এতো রাতে আপনার কাছে ছুটে আসতাম না।"

গজর গজর করতে লাগলেন শেঠজী। কিন্তু মনের ভিতরে বেশ ভয়ও করছে। অজানা আশঙ্কায় দেহটা শিরশির করে উঠছে।

দরজা খুললেন শেঠজী। যা ভয় করছিলেন তাই! সেই মদের দোকানের মালিক রাতদুপুরে ছুটে এসেছে। লোকটা ভয়ে বলির পাঁঠার মতো কাঁপছে।

কাঁদতে কাঁদতে লোকটা বললো, "সর্বনাশ হয়েছে শেঠজী। মদে চুর হয়ে ছোটরাজকুমার আমার দোকানের দরজার ওপর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি রাত্রিবেলায় একবার ভিতর থেকে বাইরে আসবার জন্যে দোকানের দরজা খুলেছি আর অমনি ছোটরাজকুমার হুমড়ি খেয়ে সামনে পড়লেন। কপালে এমন চোট লাগলো যে ছোটরাজকুমার আর বেঁচে নেই।"

এবার দোকানের মালিকের কান্না বাড়লো। "রাণা তো খবর পেলে আমাকে আস্ত রাখবেন না। আমার যা-কিছু আছে সব আপনাকে দেবো—বাঁচার একটা পথ বাতলে দিন শেঠজী।" মদের দোকানের মালিক এবার সুড়সুড় করে পাঁচ হাজার টাকার একটা তোড়া শেঠজীর হাতে গুঁজে দিলো।

রাতদুপুরে অতগুলো টাকা পেয়ে শেঠজী একটু নরম হলেন। আগে ঠিক করেছিলেন মদের দোকানের মালিককে পত্রপাঠ বিদায় করে দেবেন। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়।

এবার ব্রেন খাটাতে চেষ্টা করলেন শেঠজী। এবং শেঠজীর ব্রেন বলে কথা—কত রকমের কূটবুদ্ধি সেখানে সবসময় কিলবিল করছে।

দোকানদারকে নিয়ে শেঠজী আবার বেরিয়ে পড়লেন দোকানের সামনে থেকে রাজকুমারের মৃতদেহটা তাঁরা নিঃশব্দে তুলে নিলেন এবং দু'জনে চুপিচুপি নানা অলিগলি পেরিয়ে এক মন্ত্রীর বাড়ির সামনে হাজির হলেন।

এতো মন্ত্রী থাকতে এই মন্ত্রী কেন? কারণ শেঠজীর কাছে গোপন খবর আছে, এই মন্ত্রী লুকিয়ে-লুকিয়ে রাণার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। পা টিপে-টিপে মন্ত্রীর বাড়ির জানলার কাছে চলে এলেন শেঠজী। ঘরের ভিতরে তখন চাপা গলায় কথাবার্তা হচ্ছে।

একজন বলছে, "যত নষ্টের গোড়া হলো ওই ছোট রাজকুমার। এক এক সময় ইচ্ছে হয় ওই ছোকরাকে সাবাড় করে দিই।"

আঃ! খুব আনন্দ হচ্ছে শেঠজীর। এমন কথা যে এতো-সহজে কানে আসবে তা কল্পনাও করেন নি তিনি।

এবার রাজকুমারের মৃতদেহটা কোনোরকমে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেলেন শেঠজী এবং তাঁর বন্ধু। শেঠজী তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চান, কারণ পাঁচ হাজার টাকার তোড়াটা এখনও বিছানায় পড়ে আছে, বাক্সে পোরা হয় নি।

শেঠজী বাড়িতে ফেরার পরে আধ ঘণ্টা সময়ও বোধহয় যায় নি। আবার দরজায় ধাক্কা পড়ছে। "দয়া করে দরজা খুলুন শেঠজী। আমরা খুব বিপদে পড়েছি।"

"এখন নয়, এখন নয়। এই কি দেখা করবার সময় ?" শেঠজী আগন্তুককে হটাবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু লোকটা করুণভাবে বললো, "আমাকে এইভাবে তাড়িয়ে দেবেন না শেঠজী। আমার ভীষণ বিপদ, তাই রাতদুপুরে আপনার কাছে ছুটে আসতে বাধ্য হয়েছি।"

দরজা খুলে শেঠজী দেখলেন স্বয়ং মন্ত্রী শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। উদ্বেগে এই শীতের রাত্রেও তিনি ঘামছেন।

কথা শুরু করবার আগে মন্ত্রীমশাই দশ হাজার টাকার একটি তোড়া শেঠজীর হাতে গুঁজে দিলেন। তারপর বললেন, "শেঠজী এমন বিপদে জীবনে পড়ি নি। দু'জন বন্ধুর সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত আমোদ-আহ্লাদ করছিলাম। ছোটরাজকুমার মদ খেয়ে মাতাল হয়ে কখন আমার বাড়ির দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বুঝতে পারি নি। বন্ধুদের বিদায় দেবার জন্যে যেই দরজা খুলেছি, অমনি ধড়াস করে পড়লেন রাজকুমার। এমন চোট লাগলো মাথায় যে ছোটরাজকুমার আর বেঁচে নেই।"

এবার মন্ত্রীর চোখে জল এসে গেলো। "এ খবর যেমনি রাণার কানে যাবে অমনি আমার মুণ্ডু কাটা হবে। আমার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ছেলেমেয়েদের রাস্তায় ভিক্ষে করতে বাধ্য করবেন রাণা। শেঠজী, আমাকে বুদ্ধি দিন—আমার বাঁচার একটা পথ আপনিই বার করতে পারেন।"

শেঠজীর বুকের ভিতরটা আনন্দে গুড়গুড় করে উঠলো। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ না করে গম্ভীরভাবে তিনি বললেন, "খুবই

কঠিন এবং বিপজ্জনক কাজ, মন্ত্রীমশাই। আমার মতো একজন অর্ডিনারি লোককে এই হাঙ্গামার মধ্যে না-জড়ালেই পারতেন। আমরা কেনা-বেচা করে খাই, রাজারাজড়ার ব্যাপারে আমাদের নাক গলানোর কোনো এক্তিয়ার নেই।"

মন্ত্রীমশাই কিন্তু নাছোড়বান্দা। অগত্যা শেঠজীকে বেরোতে হলো। এবং রাজকুমারের প্রাণহীন দেহটি তৃতীয়বার কাঁধে চড়িয়ে নতুন কোনো ঠিকানার উদ্দেশ্যে হাঁটতে লাগলেন।

এবার খোদ রাজবাড়ির সামনেই হাজির হলেন শেঠজী। পুজোর দিনে প্রাসাদে খুব খানাপিনা হয়েছে। সিদ্ধির সরবতের নেশায় রাজবাড়ির প্রহরীরা সব টুলে বসে ঘুমোচ্ছে।

শেঠজী স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, "বাঁচা গেলো। এরা জেগে থাকলে আমাকে অন্য কোনো মতলব ভাঁজতে হতো।"

রাজার ঘরের দরজায় রাজকুমারের মৃতদেহটা দাঁড় করিয়ে দিলেন শেঠজী।

রাণা তখনও জেগে রয়েছেন। নিজের কানে শেঠজী শুনলেন রাণা তাঁর মহিষীকে বলছেন, "তোমার ছোট ছেলেটি কুলাঙ্গার— বংশের মুখে চুনকালি পড়ছে ওর জন্যে। এতোদিন তোমার কান্নাকাটিতে ওর বিরুদ্ধে আমি কিছু করতে পারি নি। কিন্তু আজ যদি ও কোনো গোলমালে জড়িয়ে পড়ে তা হলে তার ক্ষমা নেই— যা হবার তা কালই হবে এবং কী হবে তা আশা করি তুমি বুঝতে পারছো।"

রাণী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন এবং স্বামীকে অনুরোধ

করছেন, "অন্য যে কোনো শাস্তি দাও, কিন্তু ওর ফাঁসি দিও না।"

আর এক মুহূর্তও নয়! শেঠজী ফুড়ুক করে ওখান থেকে সরে পড়লেন।

হাঁপাতে-হাঁপাতে বাড়ি ফিরে শেঠজী এবার সোজা বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। এতো উত্তেজনা সহ্য হয় না। নেহাত অনেকগুলো টাকার ব্যাপার, না-হলে শেঠজী এইসব ঝামেলায় জড়াতেন না।

শেঠজীর কপালে কিন্তু আজ রাতে ঘুম নেই। আধঘণ্টা পরেই বাজখাঁই গলায় আর একটা লোক তাঁর নাম ধরে ডাকতে লাগলো। "খুব দরকার, এখনই দরজা খুলুন।"

"এতো রাতে আমি কারও সঙ্গে দেখা করি না। কিছু বলবার থাকলে কাল সকালে আসুন।" বিছানায় শুয়ে-শুয়ে বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন।

লোকটি এবার জানিয়ে দিলো স্বয়ং রাণা দূত পাঠিয়েছেন।

এবার তিড়িং করে উঠে পড়লেন শেঠজী। স্বয়ং রাণার নাম শোনার পরে বিছানায় শুয়ে থাকবার সাহস এখনও তাঁর হয়নি।

দরজা খুলে শেঠজী দেখলেন রাণার দুই বিশাল দেহরক্ষী ঢাল তরোয়াল নিয়ে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"রাণা এখনই আপনাকে যেতে বলেছেন।" দেহরক্ষীদের একজন খবরটা শেঠজীকে জানিয়ে দিলো।

রাজার প্রহরী, ধরে আনতে বললে এবং বেঁধে আনে। তাই শেঠজী এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করলেন না—ওদের সঙ্গেই চললেন রাণার প্রাসাদে।

রাণা তখনও জেগে বসে আছেন। তাঁর চোখে-মুখে উদ্বেগের ছাপ। শেঠজীকে দেখেই রাণা বললেন, "খুব বিপদে পড়ে গিয়েছি। এমন বিপদ যে মন্ত্রীদের সঙ্গেও পরামর্শ করতে ভরসা হলো না। একমাত্র আপনাকেই আমি বিশ্বাস করতে পারি শেঠজী।"

শেঠজী এমন ভাব দেখালেন যেন তিনি কিছুই জানেন না। তাঁর মুখে চোখেও উদ্বেগ ফুটে উঠলো। বিনয়ে বিগলিত শেঠজী বললেন, "বিপদে-আপদে এই অধম শেঠ সব সময় আপনার পিছনে আছে। দুঃখের সময় এই অধমকে যে আপনি স্মরণ করেছেন তার জন্যে ধন্য আমি।"

রাজা বললেন, "আপনার কাছে কিছুই গোপন কোরবো না। আমার ছোটপুত্রটি গোল্লায় গিয়েছিল। আজ রাত্রেই আমি ওর মৃত্যুকামনা করছিলাম। তার একটু পরেই দরজা খুলতে গিয়ে সে দড়াম করে পড়ে গেলো। মাথায় এমন লাগলো যে সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু।"

"কী বিপদ, কী বিপদ। আপনাকে শোক জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না, মহারাজ", শেঠজী অভিনয় করলেন।

রাণা বললেন, "এই মুহূর্তে আমি নিজের বিপদের দিকটাই ভাবছি। প্রজারা যদি সমস্ত ব্যাপারটা জেনে যায় তাহলে আমার

সিংহাসন থাকবে না। এই মৃত্যুর ব্যাপারটা কীভাবে ম্যানেজ করা যায় তা আপনিই বলতে পারেন।"

শেঠজী কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, "আপনি কিছু ভাববেন না। আমি সব ব্যবস্থা বাতলে দিচ্ছি। আপনি মৃত্যু সংবাদটা এখনই প্রচার করবেন না। এখনই আপনি ঘোষক পাঠিয়ে দিন। ডুন্দুভি বাজিয়ে তারা পাড়ায়-পাড়ায় প্রজাদের জানিয়ে দিক ছোটরাজকুমারকে কালসাপে কামড়েছে—রাজবৈদ্য তার চিকিৎসা করছেন।"

ঘোষকরা একটু পরেই নগরীর পথে-পথে বেরিয়ে পড়লো। প্রজারা শুনলো ছোটরাজকুমার সর্পাহত হয়েছেন।

ভোরের দিকে আবার ডুন্দুভি বেজে উঠলো। প্রজারা যা আশঙ্কা করছিল সেই খবরই পেলো। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও রাজকুমারকে বাঁচানো যায় নি।

চোখের জল ফেলতে ফেলতে প্রজারা ছুটলো নদীর ধারে রাজকুমারের শেষকৃত্য দেখবার জন্যে।

এদিকে শেঠজী তখনও রাজপ্রাসাদে বসে রয়েছেন। কুন্তজ্ঞ রাণা বললেন, "আপনার উপদেশে খুব ভাল ফল হয়েছে। কেউ আমাকে সন্দেহ করছে না। আপনার উপকার টাকা দিয়ে মাপা যায় না। তবু আপনাকে কিছু দিতে চাই। এই নিন এক লাখ টাকা।"

এক লাখ টাকা ট্যাঁকে গুঁজে শেঠজী খুশ মেজাজে বাড়ি ফিরে এলেন। রাত্রে কয়েক বার ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে বটে;

কিন্তু মা লক্ষ্মীর দয়ায় রোজগারপাতি মন্দ হলো না। বুদ্ধি খাটিয়ে শুধু নিজের মুণ্ডু বাঁচলো না, এক রাতে সম্পত্তি অনেক বেড়ে গেলো।

গৃহিণী দেখলেন শেঠজীর মুখে খুব হাসি। তিনি বললেন, "রাজকুমার মারা গিয়েছেন—সবাই কাঁদছে, আর তোমার মুখে হাসি!"

"এসব তুমি বুঝবে না, গিন্নী," মৃদু বকুনি লাগালেন শেঠজী। তারপর বললেন, "আমি খুব ক্লান্ত। এখন আমি অনেকক্ষণ ধরে ঘুমবো—কেউ যেন আমায় জ্বালাতন না করে।"



একটানা গপ্পো বলতে-বলতে ছোটমামার গলা শুকিয়ে গিয়েছে। সেটা বুঝতে পেরে বুলবুল নিজেই ছুটে গিয়ে এক গেলাস জল নিয়ে এলো।

খুব খুশী হলেন ছোটমামা, বুঝলেন দিদির হাতে ভাগ্নীর ট্রেনিং খুব ভাল হচ্ছে।

বুলবুল বললো, "মা বলে দিয়েছে, কারুর তেষ্টা পেলে সঙ্গে-সঙ্গে জল আনলে পুণ্যি হয়। মা আরও বলেছে, যখনই দেখবে বাড়িতে কেউ শুয়ে পড়েছে অথচ মাথায় বালিশ নেই তখনই একটা বালিশ এনে দেবে। না-দিলে দেবতারা রাগ করেন।"

তিলক বললো, "আমরা একবার বাপির সঙ্গে আমেদাবাদ গিয়েছিলাম। যে-বাড়িতেই আমরা দেখা করতে যাই সে-বাড়িতেই গিন্নী দু'গ্লাস জল হাতে আমাদের রিসিভ করেন। জল খেতে খেতে পেট ফুলে ঢোল।"

ছোটমামা বললেন, "আতিথেয়তার আদর্শ ব্যবস্থা। বুঝতেই পারছো শুকনো জায়গা, জলের অভাব। তাই অতিথি এলে সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য জিনিস দিয়েই ওঁরা তাঁকে অভ্যর্থনা করেন।"

শিবাজী বললো, "জল খেয়ে আরাম বাংলার গ্রামে। কোনো বাড়িতে গিয়ে জল চাইলে শুধু জল দেবে না, সঙ্গে একটু মিষ্টি থাকবেই। অতিথিকে শুধু জল দিতে নেই, এটাই ধারণা।"

ছোটমামা বললেন, "আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মতো অতিথিপরায়ণ খুব কম পাবে। যুগ যুগ ধরে কত রকম ধারণা কত পরিবারে রয়েছে, সেই অনুযায়ী তাঁরা অতিথি সেবা করে যাচ্ছেন।"

শিবাজীর বোধহয় গল্পের নেশা ধরে গিয়েছে। সে বললো, "ছোটমামা, প্লীজ, আর একখানা গপ্পো শোনবার জন্যে মনটা ছটফট করছে।"

সুযোগ বুঝে ছোটমামা বললেন, "এবার তোমরাই একটা উপকথা শুনিয়ে দাও আমাকে।"

কে গপ্পো বলবে? তিন জনের কেউ সাহস করে এগিয়ে আসছে না। শেষ পর্যন্ত আবার টক্কা-ফক্কা হলো। ডান হাতের তিনটে আঙুল বেশ খানিকটা নাড়িয়ে ছোটমামা কপালে ঠেকালেন, তারপর বললেন, "তোমরা তিনজনে ধরো। তিনটে আঙুলের মধ্যে দুটো ফক্কা একটা টক্কা।"

ছোটমামা ফলাফল ঘোষণা করলেন। "বুলবুল, তুমিই টক্কা ধরেছো, তোমাকেই এবার গপ্পো শোনাতে হবে।"

"ওমা! কী হবে?" বুলবুল বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেলো।

"কী আবার হবে? একখানা টপক্লাশ গপ্পো শুনিয়ে দেবে," শিবাজী সাহস দিলো।

ঠোঁট উল্টে, ঘাড় বেঁকিয়ে বুলবুল কিছুক্ষণ ভাবলো। কোন গপ্পোটা সে বলবে তা মনে মনে ঠিক করে নিচ্ছে।

বুলবুলের ঘাড় এবার সোজা হলো। শিবাজী বললো, "বোঝা যাচ্ছে, গল্প হ্যাজ কাম্—গপ্পো এসে গিয়েছে।"

তিলক বললো, "চুপ—এখন নো হাঙ্গামা।"

বুলবুল বললো, "যেটা শোনাবো সেটা পদ্যও বটে গপ্পোও বটে। গল্পের ছড়া বা ছড়ার গল্পও বলতে পারো। এটা শুনেছি ছোট ঠাকুমার কাছে। বাবার পিসিমা—কতো যে গপ্পো তিনি জানেন।"

"গুড—ভেরি গুড—গপ্পোকে গপ্পো আবার পদ্যকে পদ্য! যেমন টু-ইন-ওয়ান আইসক্রিম!" তিলক নিজের আনন্দ চেপে রাখতে পারলো না।

বুলবুল এবার নিজের স্মৃতি থেকে বলে চললো :

পথের মাঝে বেঙী বসে
বেঙ ছিল ঘুমিয়ে
সেই পথে এক হাতী গেলো
বেঙেরে ডিঙিয়ে।

"টপ ক্লাশ! বেশ জমে উঠেছে। তারপর কী হলো?" জানতে চাইছে শিবাজী।

বুলবুল আবার পদ্যের গল্প শুরু করলো :

দেখে বেঙী বেগে বলে
"আরে বেটা গদা-পাও

এত বড় সাধ্যি তোমার
মোর প্রভুকে ডিঙিয়ে যাও ?
যদি প্রভু জাগতো
তবেই তো খুনোখুনি লাগতো।”

বুলবুলের এবার নিজেরই হাসি আসছে। কিন্তু নিজে হাসলে গল্প বলা যায় না। কোনোরকমে হাসি চেপে সে বললো :

শুনে হাতী হেসে বলে
“ওগো ভেচ্‌কী-মুখী
তোর প্রভু কি করতে পারে
তুই বা পারিস কি ?
যদি আমি মনে করি
তোর প্রভুকে চটকে মারি।”

নাঃ, আবার হাসি এসে যাচ্ছে বুলবুলের। হাসিটা ছেড়ে দিয়ে এবং পদ্য থামিয়ে বুলবুল বললো, “বেঙী এখন রেগে ফায়ার।”

সে আবার শুরু করলো :

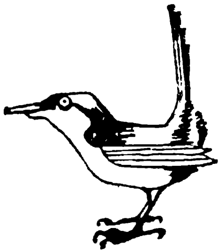
রেগে বেঙী বলে যেয়ে
ছুঁচোর মেয়ের কাছে
“ওলো গন্ধবেণের ঝি
কথা শুনে—গা জ্বালা করে
আমি নাকি ভেচ্‌কী-মুখী ?”
ছুঁচোর মেয়ে মুচ্‌কি হেসে
বললে কদর করে

"রূপের ডালি বিদ্যাধরী
তুমি যাও ঘরে
ছোটলোকের সঙ্গে কি কেউ
বাক্যি আলাপ করে?"

যেমনি বুলবুল থামলো অমনি একসঙ্গে হাততালি শুরু হলো।
"ওয়েল ডান বুলবুল," শিবাজী এবং তিলক দুজনেই আদরের বোনকে অভিনন্দন জানালো।

তিলক বললো, "আমি তো ভাবলাম ব্যাঙের সঙ্গে হাতীর না ফাইটিং শুরু হয়ে যায়। প্রেস্টিজে ঘা পড়লে কারুর মাথার ঠিক থাকে না।"

"ফাইটিং হবে কী করে? ভেচ্কী-মুখীদের কী অত সাহস থাকে?" এই বলে বুলবুল প্রাণখোলা হাসিতে ঘর ভরিয়ে তুললো।



ছোটমামা বললেন, "আমি আবার টক্কা ফক্কা করছি। এবার দুটো আঙুলে—একটা ধরবে তিলক আরেকটা শিবাজী।"

আঙুল দুটো জোরসে নাড়িয়ে কপালে ঠেকানো হলো—তারপর হলো ভাগ্য পরীক্ষা।

মামা ফলাফল ঘোষণা করলেন। "এবার শিবাজীকে গল্প বলতে হবে।"

ফলাফল শুনে বেশ মুষড়ে গেলো শিবাজী। সারাজীবন সে গল্প শুনেই এসেছে—গল্প না-বললে দাদু, দিদিমা, পিসিমা এবং মায়ের ওপর অত্যাচার করেছে। কিন্তু নিজে কখনও এই ফ্যাসাদে পড়েনি।

"গল্প? গপ্পো?" আমতা-আমতা করতে লাগলো শিবাজী।

মুখ শুকনো করে শিবাজী বললো, "গপ্পো আমি বানাতে পারি না।"

"বানাতে বলছে কে তোমাকে?" তিলক এবার মুখ খুললো। "যেসব গপ্পো শুনেছো তারই একটা বলো." সাহস দিলেন ছোটমামা। "আমরা তো কেউ নতুন গপ্পো বলছি না। চিরকালের

গপ্পো, যা চিরকাল চলে এসেছে এবং চিরকাল চলবে তাই নিজের মতো করে বলছি।"

তবু মাথা চুলকোচ্ছে শিবাজী। "গপ্পো শুনতে খুব ভাল লাগে—কিন্তু গপ্পো মনে রাখা সোজা কাজ নয়।"

ছোটমামা বললেন, "কথাটা মিথ্যে নয়—গ্রামেগঞ্জে তাই হয়েছে। যে গপ্পো তারা শুনেছে তা আবার বলবার সময় পাল্টে গিয়েছে। মুখে-মুখে গপ্পো ছড়ানোর এই বিপদ—কিন্তু এইভাবেই একই গপ্পো এক এক যুগে দেশের অবস্থা এবং মানুষের মর্জি মতো পাল্টেছে।"

শিবাজী বুঝতে পারছে, ছোটমামা তাকে একটু ভাববার সুযোগ দিচ্ছেন। পটাপট পুরনো স্মৃতিগুলো নেড়ে নিলো শিবাজী।

এইভাবে ভাবতে-ভাবতে একটা মুখ মনে পড়ে গেলো। বাবার পাঞ্জাবী ড্রাইভার বুটা সিং।

শিবাজী বললো, "বুটাচাচাকে আমি একবার পাকড়াও করেছিলাম গপ্পো শোনাবার জন্যে। তখন আমার গপ্পের নেশা ধরে গিয়েছে—রোজ একটা গল্প না শুনলে খুব খারাপ লাগে।"

বুটা সিং বলেছিল, "আমি গাড়ি চালাই, গপ্পো জানি না।"

কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। "গল্প তোমাকে শোনাতেই হবে বুটাচাচা।"

তখন বাধ্য হয়ে বুটাচাচা বললো, "শোনো তবে। গপ্পোটা আমি শুনেছিলাম লুধিয়ানায়—আমাদের গ্রামে। কতদিন আগেকার কথা, কিন্তু গল্পটার পাঁচটা মূল্যবান উপদেশ আমি এখনও মনে

রেখে দিয়েছি।”

শিবাজী বললো, “আমি গল্পোটা ঠিক মনে রেখেছি কিনা জানি না। আমার ভয় করছে।”

“ভগবানের নাম করে ঝুলে পড়ো—তারপর আপীলে আমরা দেখে নেবো,” বললেন ছোটমামা।

শিবাজীর পাঞ্জাবী গল্প শুরু হয়ে গেলো :

অনেকদিন আগে এক গ্রামে একটি ছেলে ছিল! নাম তার রাম সিং। যেমন সুন্দর দেখতে তেমন মিষ্টি ব্যবহার—গ্রামের সবাই তাকে ভালবাসতো।

কিন্তু রাম সিং-এর মনে সুখ নেই। রাম সিং-এর সৎ মা দিনরাত গজ গজ করেন এবং যা-তা বলেন। অবস্থা এমন হয়ে উঠলো যে রাম সিং বুঝতে পারলো ভিন দেশে গিয়ে রোজগারপাতি করে নিজের পায়ে দাঁড়ানো ছাড়া কোনো উপায় নেই।

যেমন ইচ্ছা তেমন কর্ম। রাম সিং ঠিক করলো সে দেশ ছেড়ে চলে যাবে। নিজের সামান্য জামাকাপড় যা-ছিল তা গুছিয়ে নিলো রাম সিং। প্রাণ চায় না, কিন্তু ঘর ছাড়তেই হবে।

কাউকে না-জানিয়েই বেরিয়ে পড়তে চায় রাম সিং। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গুরুমশায়ের কথা মনে পড়ে গেলো। ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করে রাম সিং—ওঁর পাঠশালাতেই সে লেখাপড়া শিখেছে।

তখনও ভাল করে অন্ধকার কাটে নি। রাম সিং পুঁটুলি বগলে গুরুমশায়ের বাড়িতে হাজির হলো। অভিজ্ঞ গুরুমশায় প্রাক্তন ছাত্রের মুখের দিকে তাকিয়েই সব বুঝতে পারলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, "বাছা, কী হয়েছে? বলো।"

"তেমন কিছু নয়, গুরুমশায়। কিন্তু সংসার ছেড়ে আমি ভাগ্য সন্ধানে বেরিয়ে পড়বো ঠিক করেছি।"

রাম সিং-এর কথা মন দিয়ে শুনলেন গুরুমশায়। তারপর বুঝিয়ে বললেন, "অযথা রাগ কোরো না। বাপের বাড়িতেই থেকে যাও। পণ্ডিতরা বলেন, বিদেশে গিয়ে পুরো পেট খাওয়ার থেকে নিজের ঘরে বসে আধপেটা থাকা ভাল।"

কিন্তু অশান্তির সংসারে থেকে যাবার কোনো ইচ্ছে নেই রাম সিং-এর। গুরুমশায় নিজেও আর ছাত্রকে পীড়াপীড়ি করলেন না।

গুরুমশায় এবার রাম সিং-এর পিঠে হাত রেখে সস্নেহে বললেন, "বুঝছি, মনস্থির যখন করে ফেলেছো তখন তুমি দেশ ছেড়ে যাবেই। সে-ক্ষেত্রে মন দিয়ে আমার কথা শোনো—পাঁচটা পরামর্শ দেবো তোমায়, এগুলো মনে রাখলে তোমাকে বিপদ স্পর্শ করবে না।"

গুরুমশায়ের চরণ স্পর্শ করে রাম সিং বললো, "আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন এবং উপদেশ দিন।"

গুরুমশায় বললেন, "প্রথম উপদেশ—যাঁর কাছে কাজ করবে তিনি যা আদেশ দেবেন তা নির্দ্বিধায় মেনে চলবে। দ্বিতীয় উপদেশ—কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না বা কাউকে কড়া কথা বলবে না। তৃতীয় উপদেশ—কখনও মিথ্যে কথা বলবে না। চার নম্বর—যাঁরা তোমার থেকে উঁচু শ্রেণীর লোক তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিছু করবার চেষ্টা করবে না। এবং যেখানেই যাবে সেখানেই

ধার্মিক এবং পণ্ডিত লোকদের সংস্পর্শে আসবে এবং কিছুক্ষণ তাঁদের শাস্ত্রপাঠ শুনবে যাতে তুমি সত্য থেকে বিচলিত না হও।”

আর একবার গুরুমশায়ের পদধূলি নিয়ে রাম সিং ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো এবং যাবার আগে বললো, “আপনার উপদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবো।”

কয়েকদিন ঘুরতে-ঘুরতে রাম সিং বিরাট এক শহরে হাজির হলো। তার অবস্থা এখন সঙ্গীন, সঙ্গে যা পয়সা ছিল তা শেষ হয়ে এসেছে। যে কোনো একটা কাজ জোগাড় করতে না-পারলে তাকে এবার অনাহারে থাকতে হবে।

হাঁটতে-হাঁটতে একটা গমের আড়তের সামনে হাজির হলো রাম সিং। একজন ধনী ব্যবসায়ী সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাম সিং তাঁকেই অনুরোধ করলো, “যে কোনো একটা কাজ যোগাড় করে দিতে পারেন, স্যর? কাজ আমার বিশেষ দরকার।”

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক কিছুক্ষণ ধরে রাম সিং-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু তিনি কোনো কথা বলছেন না। বেশ চিন্তায় পড়ে গেলো রাম সিং—বোধ হয় ভাগ্যে আরও কষ্ট আছে।

শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক মুখ খুললেন। “আমার কাছে কোনো চাকরি নেই। তবে অন্য জায়গায় একটা ব্যবস্থা হতে পারে।”

“যদি আমাকে একটু সাহায্য করেন। চাকরি ছাড়া আমার গতি নেই,” রাম সিং সবিনয়ে বললো।

লোকটা তখন খবর দিলো, “গতকাল আমাদের রাজার প্রধান উজীর তাঁর চাকরকে তাড়িয়েছেন। তিনি একটা পছন্দ মতো

লোক খুঁজছেন। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, কাজটায় তোমাকে মানাবে। বুঝতেই পারছো, প্রধান উজীরের খাস চাকর—একটু সুদর্শন এবং বেশ জওয়ান না-হলে ভাল দেখায় না। তুমি বরং ওখানেই একবার চেষ্টা করে দেখো।"

ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে রাম সিং তখনই উজীরের বাড়ির দিকে ছুটলো। এসব ব্যাপারে দেরি করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়—খবর পেয়ে কে আগে এসে চাকরিটা বাগিয়ে নেবে তার ঠিক নেই।

রাম সিং-এর চমৎকার স্বাস্থ্য এবং সুন্দর ব্যবহার দেখে উজীরের পছন্দ হয়ে গেলো। মস্ত এই লোকের খাস চাকরের পদটি পেয়ে ভগবানকে নমস্কার জানালো রাম সিং।

উজীর কথাটার মানে জানা নেই তিলকের। সে বলে বসলো. "উজীর কি ব্যবসাদার?"

"মোটেই নয়। রাজাউজীর মারা কথাটা শোনোনি?" বুলবুল উত্তর না দিয়ে পারলো না। "উজীর মানে মন্ত্রী—রাজাকে যিনি মন্ত্রণা দেন।"

শিবাজী আবার শুরু করলো :

রাজা একদিন তাঁর সৈন্যসামন্ত লোক-লস্কর নিয়ে রাজধানী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। উজীরকেও সঙ্গে যাবার নির্দেশ দিলেন তিনি।

রাজার দলবল মানেই বিশাল ব্যাপার। অসংখ্য সৈন্যসামন্ত চাকরবাকর ছাড়াও, গাইয়ে-বাজিয়ে, নর্তকী, হাতি, ঘোড়া, উট

থেকে আরম্ভ করে গাধা ছাগল পর্যন্ত সঙ্গে চলেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে গোটা একটা শহরের লোক দল বেঁধে পথে বেরিয়ে পড়েছে।

তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে নানা জায়গা ঘুরে রাজার দলবল এবার অজানা এক অঞ্চলে ঢুকে পড়লো। এ এক অদ্ভুত জায়গা: চারদিকে শুধু বালি আর বালি। দলবল একটু নড়া-চড়া করলেই এমন ধুলো ওঠে যে সূর্যের আলো ঢেকে যায়, মনে হয় যেন মেঘে ভরে গিয়েছে সমস্ত আকাশ।

এই মরুভূমি ভেঙে যেতে-যেতে দিনের শেষে রাজার দল একটা ছোট্ট গ্রামে উপস্থিত হলো। গ্রামের মোড়ল ছুটে এলেন রাজার সঙ্গে দেখা করতে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে রাজাকে শ্রদ্ধা জানালেন মোড়ল। বললেন, "রাজামশায়ের আবির্ভাবে গ্রামের লোকজন ধন্য, সকলের সেবার জন্য তাঁরা অবশ্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। কিন্তু......"

কিন্তু শুনেই রাজা মুখ তুলে মোড়লের দিকে তাকালেন এবং দেখলেন বেচারার মুখ শুকনো। রাজা তখন মোড়লকে বললেন, "কোনো ভয় নেই। আপনাদের কোনো অসুবিধা থাকলে নির্দ্বিধায় বলুন।"

মোড়ল তখন কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললেন, "মহারাজ, কত ভাগ্য করলে আপনার সেবার সুযোগ পাওয়া যায়। ঈশ্বরের দয়ায় খাবারদাবারও আছে আমাদের ঘরে—কিন্তু এক ফোঁটা জল নেই। অভাগা এই দেশে না আছে কোনো নদী না ঝর্ণা—না কোনো কুয়ো। জল না হলে এতো লোকের চলবে কী করে?"

জলই তো জীবন। জল নেই শুনে সবাই বেশ চিন্তায় পড়ে গেলো। রাজা সঙ্গে সঙ্গে উজীরকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, 'যেখান থেকে পারো জলের ব্যবস্থা করো।"

রাজা হুকুম দিয়েই খালাস—এই মরুভূমির দেশে কীভাবে জল জোগাড় হবে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দায়িত্ব এখন থেকে বেচারা উজীরের। জলের ব্যবস্থা না হলে উজীরের মুণ্ডুই হয়তো কাটা যাবে।

উজীর কিছুক্ষণ একমনে ভাবলেন, তার পর গ্রামের বৃদ্ধ লোকদের কাছে খবর পাঠালেন। জনে জনে তিনি জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, "এ গ্রামে না হয় জল নেই—কিন্তু আশে-পাশে কোথায় জলের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে?"

গ্রামের বৃদ্ধরা কোনো সাহায্য করতে পারছেন না। "কোথায় জল?"

শেষে দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ বললেন, "সত্যি কথা বলতে এই গ্রামের মাইলখানেক দূরেই একটা বিরাট কুয়ো আছে। কিন্তু···

"কোনো কিন্তু নয়, আপনি আমাকে সমস্ত খবর দিন। জলের জোগাড় আমাদের করতেই হবে," বললেন উজীর।

সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বৃদ্ধ তখন বললেন, "মন্ত্রীমশাই কুয়ো আছে, কিন্তু কোনো কাজে লাগবে না। কয়েকশ বছর আগে একজন রাজা ওই পাথরবাঁধানো কুয়ো খুঁড়িয়েছিলেন। এমন গভীর কুয়ো খুব কম দেখতে পাওয়া যায়—ধাপে-ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে যেন পাতাল পর্যন্ত। যত খুশী জল পাওয়া

উচিত। কিন্তু ওই সিঁড়ি বেয়ে জল আনতে গিয়ে এখনও পর্যন্ত কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরে আসে নি। ওখানে বোধহয় কোনে দৈত্যদানব আছে।"

মন্ত্রীমশাই বেশ চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি নিজে দাড়িতে হাত বুলিয়ে নিলেন। রাম সিং পাশেই দাঁড়িয়েছিল তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে মন্ত্রীমশাই বললেন, "কথায় বলে, কাউকে ভালভাবে না-বাজিয়ে বিশ্বাস করবে না। রাজামশায়ের জন্য তুমি জল নিয়ে এসো।"

ভূত-প্রেত দৈত্য-দানোর নাম শুনলে কেউ সেদিকে যায় না। চাকরি রাখতে গিয়ে প্রাণ-হারানোর কোনো মানে হয় না কিন্তু রাম সিং-এর মনে পড়ে গেলো গুরুদেব বলেছিলেন, "যাঁর কাছে কাজ করবে তিনি যা আদেশ দেবেন তা নির্দ্বিধায় মেনে চলবে।"

রাম সিং সঙ্গে সঙ্গে মনিবকে জানিয়ে দিলো, জল নিয়ে আসবার জন্যে সে তৈরি। একটা খচ্চরের দুই দিকে দুটো বিশাল পিতলের ঘড়া ঝুলিয়ে নিলো রাম সিং। দুটো ছোট ঘড়া সে নিজের কাঁধে তুলে নিলো, তারপর ভগবানের নাম করে সে জলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো।

নির্জন পথ ধরে চলেছে রাম সিং। সঙ্গে সেই বৃদ্ধ যিনি পথপ্রদর্শকের কাজ করছেন। কিছুটা হাঁটার পরে মরুভূমির দেশে কয়েকটা বিরাট গাছ দেখা গেলো। বৃদ্ধ পথপ্রদর্শক কুয়োটা দেখিয়ে দিলেন দূর থেকে, কিন্তু আর এগোলেন না। বললেন,

"আমি বুড়ো মানুষ, তাছাড়া আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন," এই বলে তিনি চটপট বিদায় নিলেন।

রাম সিং-এর অস্বস্তি লাগছে, কিন্তু কোনো উপায় নেই। একটা গাছের সঙ্গে খচ্চরটাকে সে বেঁধে ফেললো, তারপর বড় ঘড়া দুটো তুলে নিয়ে কুয়োর কাছে চলে এলো। এরকম বিরাট কুয়ো রাম সিং আগে কখনো দেখেনি। কুয়োর সিঁড়িটাও রাম সিং-এর নজরে পড়লো। দামী শ্বেতপাথরের সিঁড়ি থাকে-থাকে নিচে নেমে গিয়েছে।

কোথাও কোনো প্রাণের লক্ষণ নেই—শ্বেতপাথরের বুকে রাম সিং-এর খালি পা পড়লেও যেন শব্দ হচ্ছে। রাম সিং-এর সাহস যে ফুরিয়ে আসছে তার প্রমাণ পাওয়া গেলো—একটা ঘড়া হাত ফসকে পড়ে গিয়ে ঝন্‌ঝন্ করে আওয়াজ করে উঠলো।

একবার ইচ্ছে হলো ফিরে যায়—কিন্তু রাম সিং পরাজয় মেনে নেবে না। সে মনোবল সংগ্রহ করে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নামতে লাগলো। এবার ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ঘড়া দুটো ভাল করে ধুয়ে রাম সিং জল বোঝাই করলো।

কিন্তু এই সিঁড়ি বেয়ে একসঙ্গে দুটো ঘড়া তুলে আনা অসম্ভব। জলবোঝাই একটা ঘড়া নিয়ে রাম সিং এবার ওপরে উঠতে লাগলো।

দু' এক পা ওঠবার পরেই কী যেন একটা নড়ে উঠলো। রাম সিং-এর বুকের রক্ত এবার হিম হয়ে উঠলো। সে দেখলো বিরাট এক দৈত্য তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দৈত্যটার এক

হাতে বিরাট একখানা হাড় আর অন্য হাতে প্রদীপ। প্রদীপের অস্পষ্ট আলোয় দৈত্যের ছায়া ও কায়া ভয়াবহ এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

দৈত্য এবার কথা বললো। গলা নয়তো যেন মেঘগর্জন! "আমার সুন্দরী বউটি সম্বন্ধে তোমার ধারণা কী?"

রাম সিং দেখলো দৈত্য ওই হাড়টার দিকে প্রদীপ তুলে ধরেছে এবং মাঝে মাঝে হাড়টাকে আদর করছে।

এই দৈত্যের খুব সুন্দরী বউ ছিল এবং দৈত্য তাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসতো। সুন্দরী বউটি হঠাৎ মারা যায়, কিন্তু ভালবাসায় অন্ধ দৈত্য বিশ্বাসই করলো না যে তার বউ মরে গিয়েছে। বউ-এর মৃতদেহটা কাঁধে নিয়ে সেই থেকে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেহটা পচতে পচতে এখন বীভৎস হাড়ের টুকরো ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই।

রাম সিং অবশ্য এই ঘটনা জানতো না, কিন্তু গুরুর দ্বিতীয় উপদেশ তার মনে পড়ে গেলো—কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না বা কাউকে কড়া কথা বলবে না।

রাম সিং এবার দৈত্যকে বললো, "সত্যি স্যর, এমন সুন্দরী স্ত্রী আপনি কোথায় পাবেন?"

"ভগবান তোমাকে চমৎকার এক জোড়া চোখ দিয়েছেন।" আনন্দে উৎফুল্ল দৈত্য বলে উঠলো। "তোমার অন্তত দেখার ক্ষমতা আছে। এর আগে আমি যে কত লোককে খুন করেছি। তারা সবাই আমার স্ত্রীকে অপমান করেছে, বলেছে তোমার স্ত্রী কোথায়? তুমি তো কতকগুলো হাড়ের টুকরো নিয়ে ঘুরে

বেড়াচ্ছো। ইয়ংম্যান, তোমাকে দেখে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি, আমি তোমাকে সাহায্য করবো।"

দৈত্য এবার জলবোঝাই ঘড়াগুলো মুহূর্তের মধ্যে ওপরে তুলে এনে খচ্চরের পিঠে বেঁধে দিলো। রাম সিং ফিরে যাবার জন্যে তৈরি। কিন্তু দৈত্য ছাড়বে না, একটা বর নিতেই হবে রাম সিংকে।

রাম সিং কিছুই চাইছে না। দৈত্য তখন বললো, "এখানকার রাজার সমস্ত ধনরত্ন কোথায় জমা আছে তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

রাম সিং ধন্যবাদ জানিয়ে বললো, রাজার ধনে তার কোনো লোভ নেই। তবে দৈত্য যদি সত্যিই সন্তুষ্ট হয়ে থাকে তাহলে এই কুয়োটা যেন ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায়, যাতে সাধারণ মানুষ এখানকার জল ব্যবহার করতে পারে।

দৈত্য বোধহয় ভেবেছিল, রাম সিং বিরাট কিছু একটা চেয়ে বসবে। তাই অল্পে ছাড়া পাবার আনন্দে সে বললো, "তথাস্তু। আমি এই কুয়ো থেকে সরে যাচ্ছি।"

জলের ঘড়া নিয়ে রাম সিংকে জলজ্যান্ত অবস্থায় ফিরে আসতে দেখে মন্ত্রী এবং রাজা খুব খুশী হলেন। কুয়োর ওখানে কী হয়েছিল তার কিছুই প্রকাশ করলো না রাম সিং। শুধু রাজাকে কুর্ণিশ করে সে বললো, "মহারাজ, কুয়ো থেকে জল আনতে যাবার আর কোনো অসুবিধে নেই, যে কেউ এখন ওখানে যেতে পারে।"

এরপর সত্যিই জল আনবার কোনো অসুবিধা হলো না—কেউই কুয়োর কাছে দৈত্যকে আর দেখতে পায়নি।

রাম সিং-এর ওপর বেজায় খুশী হয়ে রাজা তাঁর মন্ত্রীকে বললেন, "আমার খাস চাকরকে আপনি নিন, তার বদলে রাম সিংকে আমি চাই।"

এইভাবে রাজকর্ম করার সুযোগ পেলো রাম সিং। এবং ক্রমশই সে রাজার বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠলো।

রাম সিং কিন্তু সব সময় গুরুর তৃতীয় উপদেশ মনে রেখেছিল — সৎ হবে এবং মিথ্যে কথা বলবে না। ফলে একের পর এক পদোন্নতি হতে লাগলো রাম সিং-এর এবং যথাসময়ে রাজা তাকে কোষাধ্যক্ষ করে দিলেন।

কোষাধ্যক্ষ কথাটার মানে জানা ছিল না তিলকের। ছোট-মামা বুঝিয়ে দিলেন, "খুব দায়িত্বপূর্ণ পদ। ইংরিজিতে বলে ট্রেজারার। রাজার ভাণ্ডারে যত রত্ন আছে, যত টাকা আছে তার দায়িত্ব এই কোষাধ্যক্ষের ওপর। সরকারের যা-কিছু খরচপাতি তা এই কোষাধ্যক্ষের মাধ্যমেই হয়।"

শিবাজী আবার শুরু করলো :

রাম সিং তো কোষাধ্যক্ষ হলো, কিন্তু তার কপালে এখনও বেশ বিপদ রয়েছে। রাজার এক ভাই ছিলেন। এই হিংসুটে দুষ্টু ভাইটা মনে মনে রাজাকে একেবারে দেখতে পারতেন না। তাঁর মতলব ছিল, যখন যা খুশি টাকা রাজার ভাণ্ডার থেকে সরিয়ে ফেলবেন।

এই টাকায় শুধু নিজের সাধ-আহ্লাদ মেটাবেন তা নয়, গোপনে-গোপনে রাজার সৈন্যদের মধ্যে টাকা ছড়াবেন এবং রাজার

কয়েকজন অনুচরকে টাকার জোরে বশ করবেন। তারপর সুযোগ বুঝে রাজাকে খতম করে নিজেই সিংহাসনে চড়ে বসবেন তিনি।

এ-ব্যাপারে রাম সিংকে নিজের দিকে টানা বিশেষ প্রয়োজন। রাজার ভাই খুবই চালাক। নিজের মতলবটা নিজের মাথাতেই রেখেছেন, রাম সিংকে কিছুই বুঝতে দিচ্ছেন না, কিন্তু সুযোগ পেলেই রাম সিংকে তোষামোদ করতে লাগলেন।

ছোটমামা এক মিনিট গল্প থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "রাজার ভাইকে সে যুগে কী বলা হতো?" কেউ উত্তর জানে না। মৃদু হেসে ছোটমামা বললেন, "রাজার ভাইকে অনেক জায়গায় বলা হয় কুমার রাজা আর ভায়ের বউ হন কুমাররানী।"

ছোটমামা আবার শিবাজীকে গল্প চালিয়ে যাবার গ্রীন সিগন্যাল দিলেন। শিবাজী আরম্ভ করলো :

কুমার রাজা নিজের মতলব সারবার জন্যে এমন মরীয়া হয়ে উঠলেন যে রাম সিংকে দলে টানবার জন্যে নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন।

খোদ রাজপরিবারে বিয়ের সুযোগ! যে কোনো লোকই এক কথায় রাজী হয়ে যেতো। কিন্তু গুরুর চার নম্বর উপদেশটা রাম সিং-এর মনে পড়ে গেলো। গুরু বলেছিলেন: যাঁরা তোমার থেকে উঁচু শ্রেণীর লোক তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা কোরো না।

রাম সিং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে এই রাজকীয় বিয়েতে অক্ষমতা প্রকাশ করলো। "আমরা অতি সাধারণ মানুষ, রাজার বাড়ির মেয়ে বিয়ে করতে যাবো কোন্ সাহসে?"

কুমার রাজা কিন্তু ভুল বুঝলেন। ষড়যন্ত্রের প্রথম পর্যায়েই বাধা পড়ায় তিনি একেবারে খাপ্পা হয়ে উঠলেন।

কুমার রাজা প্রতিজ্ঞা করলেন, পথের এই কাঁটা সরাতেই হবে। রাম সিং-এর সর্বনাশ না-করা পর্যন্ত তাঁর চোখে ঘুম নেই।

একদিন সুযোগ বুঝে তিনি রাজার সঙ্গে গোপনে কথাবার্তা বললেন। মিথ্যে করে জানালেন, কোষাধ্যক্ষ রাজা সম্বন্ধে অসম্মান-সূচক কথাবার্তা বলেছে এবং রাজপরিবারের মেয়েকে অপমান করেছে।

কী কথা বলেছে রাম সিং, কীভাবে রাজার অপমান হয়েছে তা কেউ জানে না। কুমার রাজা নিজেও তা ব্যাখ্যা করলেন না। সে যুগের রাজাদের আত্মসম্মান জ্ঞান খুব টনটনে ছিল, কেউ রাজনিন্দা করেছে শুনলে তাঁদের মাথার ঠিক থাকতো না। কুমার রাজার গোপন কথা শুনে রাজার মুখ অপমানে লাল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, যতক্ষণ না রাম সিং-এর মুণ্ডু কাটা হচ্ছে ততক্ষণ তিনি, কুমার রাজা এবং রাজকুমারী কেউ জলস্পর্শ করবেন না।

বেজায় খুশী হয়ে কুমার রাজা বিদায় নিচ্ছিলেন। কিন্তু রাজা হঠাৎ বললেন, "আমি চাই না কেউ জানুক যে আমারই হুকুমে কোষাধ্যক্ষের মুণ্ডুচ্ছেদন হয়েছে। ব্যাপারটা খুব গোপনে সারতে হবে। কোনো রকমে যদি ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যায় তাহলে কিন্তু তোমার গুরুতর শাস্তি হবে।"

রাজা এবার তাঁর একজন সেনাপতিকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, "কয়েকজন সৈন্য নিয়ে তুমি বনের মধ্যে যে ছোট দুর্গ তৈরি

হচ্ছে ওখানে চলে যাও। যদি কেউ ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করে এই দুর্গ তৈরির কাজ কখন শেষ হবে বা এই সংক্রান্ত অন্য কোনো প্রশ্ন তোলে তা হলে তৎক্ষণাৎ তার মাথা কেটে ফেলবে। দেহটাকে বনের মধ্যেই পুঁতে রেখে মাথাটা নিয়ে রাজপ্রাসাদে চলে আসবে।"

হুকুমটা একটু অদ্ভুতই মনে হলো সেনাপতির। কিন্তু রাজার হুকুম তালিম করাই তাঁর কাজ, রাজা কেন হুকুম করছেন তা জানবার এক্তিয়ার নেই সেনাপতির। স্যালুট করে নির্দেশ মান্য করবার জন্যে সেনাপতি বিদায় নিলেন।

সমস্ত রাত রাজা ঘুমোতে পারলেন না। ভোরবেলায় তিনি রাম সিংকে ডাকলেন। বললেন, "বনের মধ্যে যেখানে ছোট দুর্গ তৈরি হচ্ছে সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসো কাজকর্ম কেমন এগোচ্ছে, কবে দুর্গ শেষ হবে এবং ঝটপট ফিরে এসে আমাকে রিপোর্ট করো।"

রাম সিং সঙ্গে-সঙ্গে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়লো। যেতে যেতে শহরের শেষ প্রান্তে এসে রাম সিং শুনতে পেলো ছোট এক মন্দিরের ভিতর কে যেন উদাত্তকণ্ঠে ধর্মপাঠ করছেন। গুরুর পঞ্চম উপদেশটা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেলো : যেখানে যাবে সেখানেই ধার্মিক এবং পণ্ডিত লোকদের সংস্পর্শে আসবে এবং কিছুক্ষণ তাঁদের শাস্ত্রপাঠ শুনবে।

রাম সিং এবার মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়লো এবং এক কোণে বসে শাস্ত্রপাঠ শুনতে লাগলো। বেশিক্ষণ বসবার কোনো পরিকল্পনা ছিল না, কিন্তু জ্ঞানের কথা শুনতে-শুনতে রাম সিং এমন মোহিত

হয়ে পড়লো যে ওঠবার তাগিদই রইলো না। এক মনে শাস্ত্র আলোচনা শুনে যাচ্ছে রাম সিং আর ক্রমশই বেলা বেড়ে চলেছে।

এদিকে দুষ্টু কুমার রাজা বেশ অসুবিধায় পড়ে গিয়েছেন। রাজ আদেশ অমান্য করবার উপায় নেই, কিন্তু বেশ ক্ষিদে লাগছে। ওদিকে রাজকন্যাও ক্ষিদের জ্বালায় কাঁদছেন, রাম সিং-এর মুণ্ড না আসা পর্যন্ত সকালের জলখাবার মুখে দেওয়ার হুকুম নেই।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে। দুষ্টু কুমার রাজা ছটফট করছেন এবং খবরের আশায় কয়েক মিনিট অন্তর জানলার দিকে ছুটে যাচ্ছেন। শেষে আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না তিনি। তাড়াতাড়ি ছদ্মবেশ ধারণ করলেন তিনি—গোঁফ দাড়ি লাগিয়ে এমন বেশ নিলেন, কারও সাধ্য নেই কুমার রাজাকে চিনতে পারে। তারপর ঘোড়ায় চড়ে ছুটলেন বনের দিকে—এই বনের মধ্যেই যে রাম সিংকে কোতল করা হবে তা রাজার মুখেই শুনেছেন তিনি।

বনের মধ্যে গিয়ে কুমার রাজা দেখলেন, কয়েকজনমাত্র লোক দুর্গ তৈরির কাজ করছে এবং কয়েকজন সৈন্য এক মনে তাদের কাজ দেখছে।

বিরক্ত হয়ে ছদ্মবেশী কুমার রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা এখানে হাঁ করে কী দেখছো? তোমাদের যে কাজ শেষ করতে পাঠানো হয়েছে তার কত দেরি?"

এই কথা শুনেই সৈন্যরা সেনাপতির মুখের দিকে তাকালো এবং চকিতে সেনাপতির নির্দেশ পেয়ে তরোয়াল দিয়ে অচেনা

আগন্তুকের মুণ্ডুচ্ছেদ করলো।

মুণ্ডুটা তারা এবার থালায় তুলে নিলো—খোদ রাজার ভাই যে প্রাণ হারালেন তা তারা বুঝতে পারলো না।

সেনাপতি এবার কাপড়ে-জড়ানো মুণ্ডু নিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে ঘোড়া ছোটালো।

এদিকে রাজা সভা থেকে ফিরে রাম সিং-এর মুণ্ডু এবং তাঁর ভাইকে না-দেখে বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলেন। ভাবলেন, নিজেই এবার খোঁজখবর নেওয়া প্রয়োজন।

একলা ঘোড়া ছুটিয়ে রাজা নিজেই বনের দিকে চললেন।

রাম সিং তখনও এক মনে মন্দিরে বসে শাস্ত্রপাঠ শুনে যাচ্ছে। হঠাৎ ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনে বাইরে তাকিয়ে রাম সিং দেখলো স্বয়ং রাজামশায় ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন। রাজার নির্দেশের কথা এবার মনে পড়ে গেলো। রাম সিং মন্দির থেকে দ্রুত বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। রাজাও এবার ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়লেন।

রাম সিংকে এখনও বহালতবিয়ত দেখে রাজা খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

এমন সময় সেনাপতিও সেখানে হাজির হলেন। হাসিমুখে রাজার সামনে মুণ্ডুর মোড়কটি এবার তিনি খুলে ধরলেন।

"এ যে আমার ভায়ের মাথা!" রাজা আর্তনাদ করে উঠলেন। "আমার ভাই ওখানে কী করে গেলো?"

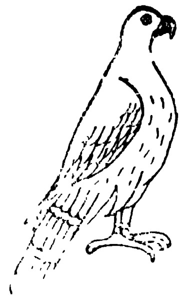
শোকার্ত রাজার মনে এখন নানা সন্দেহ উঁকি মারছে।

তিনি রাম সিং-এর কাছে কিছুই চেপে রাখলেন না। রাম সিংও এবার কাঁদতে কাঁদতে কুমার রাজার ষড়যন্ত্রের কথা প্রভুর কাছে নিবেদন করলো। যা এতোদিন গোপন ছিল তা সমস্ত ফাঁস হয়ে গেলো।

রাজা এবার রাম সিং-এর কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং তাকে রাজপ্রাসাদে ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন।

এবার একটু থামলো শিবাজী। অধৈর্য বুলবুল জিজ্ঞেস করলো, "তারপর কী হলো?"

শিবাজী বললো, "এর পর বহু বছর ধরে রাম সিং রাজার কাছে কাজ করেছিল। রাম সিং-এর ছেলেপুলে নাতি-নাতনী হয়। বুড়ো বয়সেও রাম সিং নাতিদের বলতো, গুরুজীর পাঁচটি উপদেশ মেনেছিলাম বলেই আজ আমার এতো সুখ এবং আজও আমি বেঁচে আছি। তোমরাও এই পঞ্চোপদেশ সারাজীবন মনে রাখবে।"



ছোটমামা আরও একটু বিশ্রাম নেবার মতলব আঁটছিলেন। তাঁর ইচ্ছে তিলক, শিবাজী ও বুলবুল একের পর এক গল্প বলে যাক এবং সেই সুযোগে তিনি দু' একখানা জরুরী চিঠি লিখে ফেলবেন।

কিন্তু আজ তা সম্ভব ময়। শিবাজীর গল্প শেষ হওয়া মাত্রই তিলক হাত তুললো। এই হাত তোলার মানে, সে একটা প্রশ্ন করতে চায়, কিন্তু যেহেতু সে গুড বয় সেহেতু মামার অনুমতি ছাড়া সে মুখ খুলবে না।

মামা অনুমতি দিলেন এবং তিলক বললো, "ওয়ান কোশ্চেন। সেযুগে ছোটছেলে ছিল না? আজকে যত গল্প হলো সব তো বড়দের—ছোটদের কোনো ঘটনা তখনকার যুগে ঘটতো না?"

মামা বেশ ফাঁপরে পড়ে গেলেন। তিলক বেশ ভাল প্রশ্নই করেছে। একটু হেসে তিনি জানালেন, "ছোটছেলে সে যুগে অবশ্যই ছিল এবং তারা অনেক গল্পের নায়কও হয়েছে।"

বুলবুল এবার মামাকে ধরলো তাদের বয়সী ছেলে অথবা মেয়ের একটা গল্প শোনাতেই হবে।

ছোটমামা বললেন, "তোমাদের বয়সী একটা ছেলে যা করেছিল তা হাজারখানেক বড় বহু চেষ্টা করেও পারেনি। এই ছেলেটির কথা আজও উড়িষ্যার গ্রামে-গ্রামে শোনা যায়। কিন্তু বড্ড দুঃখের গল্প তাই তোমাদের শোনাবো না ভেবেছিলাম।"

তিলক বললো, "দুঃখটা যতোটা পারো কমিয়ে গপ্পোটা আমাদের বলো, ছোটমামা। ঘটনাটা শুনে রাখা দরকার—মায়ের ধারণা ছোটরা কোনো কাজই বড়দের মতো করতে পারে না।"

"দিদির কথাটা যে সত্যি নয় তা উড়িষ্যার সমস্ত লোক জানে," মামা গম্ভীরভাবেই উত্তর দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা বিশ্ববিখ্যাত কণারকের মন্দিরের কথা শুনেছো?"

"শুধু শুনবো কেন? নিজের চোখে দেখেছি," 'বলে উঠলো শিবাজী। "সেবার বাপি, মা, আমি এবং প্রফেসর ম্যাকইনটস একসঙ্গে কণারকে গিয়েছিলাম। প্রফেসর ম্যাকইনটস বাবার বন্ধু, এডিনবরা থেকে এসেছিলেন এই কণারক মন্দির দেখতে।"

"দেখে কী বললেন?" জানতে চাইলো বুলবুল।

"দেখে একেবারে 'থ'। বাপিকে বললেন, 'সমস্ত পৃথিবী ঘুরেছি আমি, কিন্তু এমন অদ্ভুত শিল্পকর্ম কোথাও দেখিনি। পৃথিবীর সমস্ত লোক তাজমহলের নাম জানে, কিন্তু কণারক দেখলে তারা আরও অবাক হয়ে যাবে।' "

শিবাজী বললো, "আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, কণারক হয়তো কোনো 'রক'—পাহাড়-টাহাড় হবে। কিন্তু প্রফেসর ম্যাকইনটসকে বাবা বললেন, 'কোণ হলো ইংরিজী অ্যাংগ্‌ল, আর সূর্যের অপর

নাম অর্ক। অর্থাৎ কোণাকুণি স্থাপিত সূর্যমন্দির'।”

ছোটমামা মন্তব্য করলেন, “শিবাজী তুমি ঠিকই বলেছো ; পৃথিবীতে এমন অসাধারণ শিল্পকর্ম নেই বললেই চলে। ১২৫০-৬০ খ্রীষ্টাব্দে ওড়িষার রাজা নরসিংহদেব এই সূর্যমন্দির তৈরি করেছিলেন। সূর্যের মূর্তি পুজো মধ্য এশিয়া থেকে আগত 'মগ'-নামধারী ব্রাহ্মণরা এদেশে প্রচলিত করেন। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে সূর্যের পুজো করে সেরে যান। ক্রমশ সমস্ত ভারতবর্ষে সাতটি অর্কক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কণারক তাদেরই একটি।”

“অন্যগুলো কোথায় ?” জানতে চায় শিবাজী।

ছোটমামা বললেন, “ঠিক কোথায় তা আমাদের জানা নেই ; তবে কয়েকটি নাম পাওয়া গিয়েছে—লোলার্ক, বরুণার্ক, পুণ্ড্রার্ক।”

শিবাজী বললো, “সত্যি, কণারক দেখলে মাথা ঘুরে যায় ; মন্দিরটা সূর্যদেবের রথের আকারে তৈরি। যে বেদির ওপর মন্দির প্রতিষ্ঠিত তার গায়ে চব্বিশখানা বিরাট চাকা খোদাই করা আছে। প্রতিটা রথচক্রের সাইজ ন' ফুট। মন্দিরের চারটে দ্বার ছিল—তিনটে দ্বার এখনও দেখা যায়। পূর্বে সিংহদ্বারে বিরাট এক সিংহমূর্তি, দক্ষিণদ্বারে একজোড়া ঘোড়া, উত্তরে একজোড়া হাতি রয়েছে।”

চোখদুটো বড় বড় করে শিবাজী বললো, “সমস্ত মন্দিরের গায়ে যা কারুকার্য খোদাই করা রয়েছে তা দেখলে মানুষের কাজ বলে বিশ্বাসই হয় না।”

ছোটমামা বললেন, "১৬২৭ খৃষ্টাব্দে রাজা পুরুষোত্তমদেব কণারকের পরিত্যক্ত মন্দির দেখে তা মাপবার নির্দেশ দেন। তখনও এই মন্দির ২২০ ফুটের বেশী উঁচু ছিল। এখন উচ্চতা ১২৯ ফুট।"

ছোটমামার নজর এবার বুলুবুলের দিকে পড়লো। তিনি বুঝলেন সে গল্প শুনতে চাইছে।

মৃদু হেসে ছোটমামা শুরু করলেন :

বারোশ শিল্পী বারো বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কণারকের মন্দির তৈরি করেছিলেন। রাজা নরসিংহদেব ওড়িষার শ্রেষ্ঠ মন্দির স্থপতিদের নিয়োগ করেছিলেন এই মন্দির তৈরির কাজে।

বিরাট এই মন্দির যাতে যথাসম্ভব দ্রুত শেষ হয় তার জন্যে রাজা নরসিংহদেব অদ্ভুত এক হুকুম দিয়েছিলেন। কণারকের মন্দির তৈরি শেষ না-হওয়া পর্যন্ত কোনো কর্মী বাড়ি ফিরতে পারবে না। নরসিংহদেব আশা করেছিলেন বাড়ি ফিরবার তাগিদে কর্মীরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মন্দিরের কাজ শেষ করবে।

ছোটমামা বললেন, "সেকালের প্রখ্যাত শিল্পীরা কোথাও নিজের নাম লিখে যান নি। এই ছিল প্রাচীন ভারতের নিয়ম — তাই কালের প্রবাহ পেরিয়ে অসংখ্য সুন্দর শিল্পকর্ম আমাদের হাতে এসেছে, কিন্তু আমরা জানি না কে তাদের স্রষ্টা।"

ছোটমামা বললেন, কণারক মন্দির তৈরি হবার পরে অন্তত সাতশ বছর কেটে গিয়েছে। কোথাও মন্দির স্থপতির নাম নেই — কিন্তু কণারকের আশপাশের গ্রামে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, সবাই বলে দেবে, এই মন্দিরের প্রধান শিল্পীর নাম : বিশু মহারাণা।

বিশু মহারাণা যখন মন্দির তৈরির কাজ নিয়ে বাড়ি থেকে বিদায় নিলেন তখন তাঁর স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। যথা সময়ে একটি ছেলে হলো তাঁর। কিন্তু রাজার আদেশ অনুযায়ী বিশু মহারাণা বাড়ি ফিরে ছেলের মুখ দেখে যেতে পারলেন না।

বারো বছর এইভাবে কেটে গেলো—মন্দিরের কাজও শেষ হয় না, বিশু মহারাণাও বাড়ি ফিরতে পারেন না। বিশুর স্ত্রী একাই ছেলেকে আদরে-যত্নে মানুষ করে চলেছেন। ছেলের নাম রেখেছেন তিনি ধর্মপাদ। আদর করে ডাকেন ধর্ম বলে।

ধর্মপাদ যাতে বংশগত স্থপতিবিদ্যা শেখে তার জন্যে মা কোনোরকম চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। নিজেই ছোট ছেলের সঙ্গে মন্দির গড়া খেলায় যোগ দিতেন। আর এ-ব্যাপারে ধর্মেরও আগ্রহের অন্ত নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে খেলার ছলে ছোট ছোট মন্দির এবং দুর্গ তৈরি করে। প্রথম দিকে মাটি দিয়ে মন্দির গড়া খেলায় সে বিভোর হয়ে থাকতো। তারপর কখন নিজেরই খেয়ালে সে কাঠ ও পাথর ব্যবহার শুরু করেছে।

দূর থেকে মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলের খেলা দেখেন ও তার প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হন।

একটু বয়স হতেই ধর্মকে পাঠশালায় পাঠালেন তার মা। পড়াশোনায় খুব মনোযোগ তার। তার বুদ্ধি এবং শেখার আগ্রহ দেখে গুরুমশায়রাও খুব খুশী হলেন।

একদিন পাঠশালে ছাত্ররা সবাই বসে স্লেট পাথরে লিখছিল। হঠাৎ ধর্মের হাত ফসকে পেন্সিলটা পড়ে গেলো।

একটা ছেলেকে সেটা তুলে দিতে বলতেই সে ফোঁস করে উঠলো। "আমাকে হুকুম করার তুমি কে? তুমি কার ছেলে হে?"

সুযোগ পেয়ে আরও কয়েকটা পড়ুয়া ধর্মের পিছনে লাগলো। তারা বললো, "খুব তো মেজাজ তোমার। বলো দেখি তোমার বাপের নাম? কোনোদিন নিজের বাপকে দেখেছো?"

ধর্ম লজ্জায় মাথা নিচু করলো। কী উত্তর দেবে সে নিজেই জানে না।

মুখ শুকনো করে সেদিন ধর্ম বাড়ি ফিরলো। তাকে দেখেই মা বুঝলেন কিছু অঘটন ঘটেছে। ছেলেকে আদর করে তিনি বললেন, "চন্দ্রভাগায় তোমার বাবা যখন থেকে মন্দির তৈরি করতে গিয়েছেন তখন থেকে তোমার মুখের হাসিটুকু দেখেই আমি বেঁচে আছি। কী হয়েছে তোমার বাছা?"

চোখের জল কোনোরকমে চেপে রেখে ধর্ম বললো, "আমার বাবাকে তো কখনও দেখিনি। আমার বাবা বাড়ি আসেন না কেন? আজ পাঠশালার ছেলেরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করলো, বললো আমার নাকি বাবাই নেই।"

মা ফোঁস করে উঠলেন। "কে বলে তোমার বাবা নেই? কার এতোবড় আস্পর্ধা? পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর যে মন্দিরটি এখন তৈরি হচ্ছে তোমার বাবা তার প্রধান স্থপতি।"

একটু থেমে মা বললেন, "আমি তো তোমাকে আগেও বলেছি, ভুবনবিখ্যাত স্থপতি পরিবারের ছেলে তুমি। তোমাদের বংশের শিল্পীরাই উৎকলের বিখ্যাত মন্দির এবং দুর্গ তৈরি

করেছেন। এতো বড় বংশে জন্ম হওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা ?"

মায়ের কাছে বসে বসে ধর্ম ক্রমশ তার পিতৃপুরুষদের অবিশ্বাস্য কীর্তি-কাহিনী শুনতে লাগলো।

ছেলেকে আদর করে মা বললেন, "তোমাদেরই পূর্বপুরুষ শ্রীক্ষেত্র পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দির তৈরি করেছিলেন। সেই মন্দিরের কাজ দেখে স্বয়ং রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন শিল্পীকে পুরস্কার দিয়েছিলেন। সম্রাট খরভেলার আদেশে তোমাদেরই পূর্বপুরুষরা উদয়গিরি গুহায় পাথর কেটে অমর শিল্পকীর্তি সৃষ্টি করেছিলেন। একাম্রকানন, অর্থাৎ ভুবনেশ্বরে, শিবের মন্দির তৈরির দায়িত্ব রাজা ললাটেন্দুদেব তোমাদের পূর্বপুরুষকেই দিয়েছিলেন। কটকে বরাবতি দুর্গ সংস্কারের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন তোমার ঠাকুর্দা। সেই যে কাজে বেরিয়েছিলেন তিনি আর ফেরেন নি। দুর্গ সংস্কার শেষ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।"

পূর্বপুরুষদের শিল্পকীর্তির কথা শুনতে-শুনতে ছোট্ট ছেলের বুক গর্বে ফুলে উঠতো। ধর্ম বলতো, "মা, তুমি দেখে নিয়ো আমিও একদিন মস্ত শিল্পী হবো।"

মা ছেলেকে কাছে টেনে আদর করতে লাগলেন। তিনি তো চান তাঁর সন্তানের প্রতিভায় এই বংশের গৌরব আরও বেড়ে উঠুক।

ধর্ম এবার তার বাবার কথা জানতে চাইলো। "বাবা কোথায় গিয়েছেন ? এখন তিনি কী করছেন ?"

মা মনের দুঃখ চেপে রেখে ছেলেকে বললেন, "সূর্যদেবের স্তুতিতে রাজা নরসিংহদেব এমন এক মন্দির স্থাপনা করতে চান সারা

বিশ্বে যার জুড়ি থাকবে না। তোমার বাবার ওপরেই এই মন্দির তৈরির দায়িত্ব চেপেছে। কিন্তু রাজার আদেশ, যতদিন না এই মন্দির শেষ হচ্ছে ততদিন কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে কেউ বেরিয়ে আসতে পারবে না, প্রিয়জনদের দেখবার জন্যে বাড়িতে আসা সম্পূর্ণ নিষেধ।”

মা আরও বললেন, “পবিত্র তীর্থক্ষেত্র চন্দ্রভাগায় সমুদ্রতীরে তোমার বাবা কণারক মন্দির তৈরির কাজে ব্যস্ত রয়েছেন—তাই তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। তবে আমি লোকমুখে শুনেছি, মন্দির তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। এবার নিশ্চয় তিনি বাড়ি ফিরে আসবেন।”

ধর্ম কয়েকদিন ধরে এক মনে কী সব ভাবলো। তারপর একদিন মাকে বললো, “মা, তুমি আমাকে চন্দ্রভাগায় যাবার অনুমতি দাও। ওখানে আমি তীর্থ করবো আর সেই সুযোগে আমার বাবাকে দেখে আসবো। এতোদিন ধরে বাবা যে-মন্দির করছেন তা শেষ হতে কতো দেরি তাও আমার জানা হয়ে যাবে। তুমি কয়েকদিনের মধ্যে আমার কাছ থেকে সব খবর পেয়ে যাবে। এইভাবে মুখ বুজে কষ্ট পেতে হবে না তোমাকে।”

বুলবুল এবার বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, “রাজা না হয় বাড়িতে আসতে বারণ করেছিলেন, কিন্তু ধর্মের বাবা তো মাঝে-মাঝে বাড়িতে চিঠি পোস্ট করতে পারতো। আমার বাপি তো বাইরে গেলে তাই করে।”

ছোটমামা বললেন, “চিঠি পোস্টিং-এর ব্যবস্থা থাকলে তবে

তো! তখন তো রাজকার্য ছাড়া সাধারণ মানুষদের জন্য কোনো ডাকব্যবস্থা ছিল না। নিতান্ত চেনাশোনা কারুর হাত দিয়ে ছাড়া চিঠি পাঠাবার কোনো উপায় ছিল না।" ছোটমামা বললেন, "এই ডাকব্যবস্থা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন—এসব আমরা হাতের পাঁচ মনে করি। কিন্তু এইসব সামান্য সুযোগের জন্য সাধারণ মানুষকে হাজার হাজার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে।"

ধর্মের কথায় ফিরে গেলেন ছোটমামা। বললেন, চন্দ্রভাগা যাবার প্রস্তাবে মা কিছুতেই রাজী হচ্ছিলেন না। কিন্তু ছেলেও নাছোড়বান্দা, সে বারবার মাকে বলতে লাগলো, "একবার আমাকে যাবার অনুমতি দাও মা।"

অগত্যা মা রাজী হলেন। ঠাকুরের কাছে ছেলের মঙ্গলের জন্য তিনি প্রার্থনা করলেন। "ঠাকুর আমার চোখের এই মণিটিকে নিরাপদে রেখো।"

বাগান থেকে কতকগুলো জাম তুলে আনলেন ধর্মের মা। বললেন, "এগুলো সঙ্গে নিয়ে যাও। এই জাম খেয়েই তোমার বাবা তোমাকে চিনতে পারবেন—এমন মিষ্টি জাম আমাদের বাগান ছাড়া কোথাও হয় না।"

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বারো বছরের ধর্মপাদ চন্দ্রভাগার দিকে হাঁটতে শুরু করলো। এইটুকু বয়স, অজানা পথ—তবু ধর্মপাদের মনে কোনো ভয় নেই। চন্দ্রভাগার কাছে যেখানে সূর্যদেবের মন্দির তৈরি হচ্ছে সেখানে নিজের বাবাকে সে খুঁজে বার করবেই।

অবশেষে দূর দিগন্তে নীল সমুদ্র দেখতে পেলো ধর্মপাদ।

শত শত অশান্ত ঢেউ ক্রুদ্ধ পশুর মতো গর্জন করতে করতে সোনালী সমুদ্রতটে আছড়ে পড়ছে। সমুদ্রের শাসন অমান্য করে ছোট ছোট ডিঙি নৌকা অজানা উদ্দেশে পাড়ি দিচ্ছে। কিছু জেলে বহুক্ষণের সমুদ্রপাড়ি শেষ করে অনেক মাছ নিয়ে তীরে ফিরছে। কিছু লোভী চিল মাছের লোভে ডিঙির মাথার ওপর পাক খাচ্ছে।

ঘাড় ফিরিয়ে সমুদ্রের ধারে নতুন মন্দিরের দিকে নজর পড়ে গেলো ধর্মপাদের। এতো সাধারণ মন্দির নয়—পাথরের কবিতা! বিস্ময়ে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না ধর্মপাদ।

আরও কাছে এগিয়ে এসে ধর্মপাদ বুঝতে পারলো বিরাট এক অঞ্চলে বিরামহীন কর্মযজ্ঞ চলেছে। সংখ্যাহীন শিল্পী আপন মনে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। ছেনি ও বাটালির সংঘাতে উৎপন্ন নানা বিচিত্র শব্দে এই জনপদ মুখর হয়ে উঠেছে—ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা বিরাট বিরাট পাথরের বুক থেকে অপরূপ মূর্তি কুঁদে বের করে আনছেন।

অসংখ্য কর্মীর এই ভীড়ের মধ্যে ধর্ম কী করে বুঝবে কে তার পিতা? মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করে ধর্মপাদ এবার বাবার নাম করলো। প্রধান স্থপতি বিশু মহারাণাকে এখানে কে না চিনবে?

অবশেষে পিতাপুত্রের সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত মিলন হলো। বাবার হাতে মায়ের দেওয়া জামগুলো তুলে দিলো কিশোর ধর্মপাদ। যে সন্তানকে দেখবার জন্যে একযুগ ধরে অসহায়ভাবে বিশু ছটফট করছেন তাকে অপ্রত্যাশিতভাবে চোখের সামনে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন কণারকের প্রধান স্থপতি।

নিজের ছেলের হাত ধরে মন্দির প্রাঙ্গণের সমস্ত কাজকর্ম দেখালেন বিশু মহারাণা।

পূর্বমুখী দেউলের দিকে অনন্ত বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো বারো বছর বয়সের ধর্মপাদ। সূর্যসারথী অরুণের মূর্তিযুক্ত স্তম্ভটি অনেকক্ষণ ধরে দেখেও চোখের তৃষ্ণা মিটছে না। মন্দিরের গায়ে অপূর্ব কারুকার্যের সমারোহ। নীচের শ্রেণীতে জীবজন্তু, সৈনিক, নাগরিক, শিকারকাহিনী, শোভাযাত্রা, বিভিন্ন নরনারীর প্রতিকৃতি খোদিত রয়েছে।

রাজা, রাজধানী, হাতি, ঘোড়া, উট, জিরাফ এবং বণিকের মূর্তিও দেখা যাচ্ছে। গাছের ছায়ায় গোরুর গাড়ি এবং রন্ধনে ব্যস্ত নারীর ছবিও অবাক বিস্ময়ে দেখলো ধর্মপাদ।

মন্দিরের উপর দিকে নৃত্যরত দেবতা ও নর্তকীদের মূর্তি দেখে মুগ্ধ হলো ধর্মপাদ। এমন এক মন্দির তার বাবার মনের মধ্যে প্রথম সৃষ্টি হয়েছে! ধর্মপাদের বুক গর্বে ফুলে উঠছে।

ছেলের হাতটি সস্নেহে জড়িয়ে ধরে প্রধান স্থপতি বললেন, "রাজা নরসিংহদেব চান এমন এক মন্দির যা সমস্ত বিশ্বকে মুগ্ধ করবে। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা আসবে সূর্যদেবের চরণে তাদের পূজা নিবেদন করতে।"

বিশু মহারাণা এবার একটু থামলেন। "বারো বছর ধরে কাজ চলেছে—এখনও মন্দির সম্পূর্ণ হলো না। কাজ সম্পূর্ণ করার জন্যে রাজা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। মন্দির প্রায় শেষ, শুধু চূড়ায় ওই কলসটুকু বসানো। কলস বসানোর বহু চেষ্টা করেছি

আমরা—কিন্তু প্রত্যেকবারই কলস ভেঙে পড়ছে। কোথাও নিশ্চয় জটিল অঙ্কের কোনো ভুল হয়ে গিয়েছে। না হলে এমন হবে কেন?”

ছেলের সামনে বাবা আবার থামলেন, তারপর দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জানালেন, অধৈর্য রাজা গতকাল আদেশ দিয়েছেন, মন্দির শেষ হবার জন্যে তিনি অনন্তকাল অপেক্ষা করবেন না। যদি আগামী তিন দিনের মধ্যে কাজ শেষ না-হয় তাহলে এখানকার সমস্ত কর্মীকে শূলে চড়ানো হবে।

ধর্মপাদ এবার বাবার মুখেই শুনলো, আজ সন্ধ্যায় সমস্ত শিল্পীদের এক সভা হবে পরিস্থিতি আলোচনার জন্য। কিন্তু কোনো আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। নিরাপদে কলস বসানোর কোনো পথই বার করা যাচ্ছে না।

এতোদিন পরে বাবা ও ছেলের মিলন—কিন্তু সামনেই নিষ্ঠুর মৃত্যুর সর্বনাশা ছায়া। ধর্মের মন খুব খারাপ হয়ে গেলো এবং সে ঠিক করলো সন্ধ্যায় আলোচনার সময় সে উপস্থিত থাকবে।

কর্মীদের সভা যথাসময়ে শুরু হলো। অনেকে অনেক রকম প্রস্তাব তুললেন, কিন্তু কোনোটাই খুব কাজের মনে হলো না।

শেষ মুহূর্তে বারো বছরের কিশোর ধর্মপাদ উঠে দাঁড়ালো। জোড়হাতে সবিনয়ে সে বললো, “দয়া করে আপনারা আমাকে একটা সুযোগ দিন। আমার বয়স যদিও কম তবু আমার মনে হচ্ছে মন্দিরের মাথায় ওই ভারি পাথরটা আমি লাগাতে পারবো। আপনারা দয়া করে না বলবেন না।”

একরত্তি ছেলেকে এই কথা বলতে শুনে উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে গেলেন। কেউ কেউ বললেন, "এতোগুলো অভিজ্ঞ শিল্পী প্রাণপণ চেষ্টা করেও যা পারলো না তা একফোঁটা ছেলে কী করে পারবে। ছোঁড়াটা বড়-বড় কথা বলছে।"

কিন্তু অনেকেই বললেন, "এখন নিজেদের মান-সম্মান দেখানোর সময় না। আমরা যখন মন্দিরের চূড়ায় কলস বসাতে ব্যর্থ হয়েছি, তখন এই ছেলেটিকে একবার সুযোগ দিতে বাধা কী? তাতে তো কিছু এসে যাচ্ছে না।"

"যথেষ্টই এসে যাচ্ছে," বললেন আর এক দল। "যখন সবাই জানবে, বারোশ নামকরা লোক যা পারেনি বারো বছরের একটা ছেলে তা করেছে, তখন লোকে আমাদের সম্বন্ধে কী ভাববে? খবরটা যখন রাজার কানে পৌঁছবে তখন কী তোমরা ভাবছো তিনি আমাদের জ্যান্ত রাখবেন?"

একজন বৃদ্ধ শিল্পী অনেকক্ষণ ধরে সমস্ত কথা শুনছিলেন। তিনি এবার মুখ খুললেন। "কলস লাগুক আর না লাগুক দু'দিক থেকেই আমাদের প্রাণ-সংশয়। এক্ষেত্রে কলস লাগানোই ভাল; কারণ আমাদের জাতের মানটুকু অন্তত রক্ষা পাবে। কিন্তু এই মন্দির যদি অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাহলে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ আমাদের অপবাদ দেবে। সুতরাং আমাদের নিজেদের ইজ্জতের কথা না ভেবে এই ছেলেটির ওপরেই দায়িত্ব দেওয়া যাক।"

পরের দিন সূর্য ওঠার মুহূর্ত থেকেই ধর্মপাদ নিজের কাজে লেগে গেলো। সমস্ত মন্দির প্রাঙ্গণ সে বহুক্ষণ ধরে ঘুরে

বেড়ালো, প্রতিটি স্তম্ভের খুঁটিনাটি সে মন দিয়ে লক্ষ্য করলো, মনে মনে অনেক জটীল অঙ্ক কষলো, তারপর ধীরে ধীরে মন্দিরের শীর্ষে উঠে গেলো যেখানে বহু চেষ্টা করেও শেষ পাথরটি বসানো সম্ভব হয় নি। আজ সমস্ত রাত ধর্মপাদ ওখানেই থেকে যাবে।

কণারকের চতুর্দিকে সমস্ত কর্মীশিবিরে সে রাত্রে প্রবল উদ্বেগ—কেউ ঘুমোতে পারলেন না। পরের দিন ভোরে সূর্যের আলো ফুটে উঠবার আগে সবাই বিস্ময়ে দেখলেন মন্দিরশীর্ষে নিরাপদে কলস বসে গিয়েছে।

ধর্মপাদ লাফাতে লাফাতে নিচে নেমে এলো এবং বাবাকে জড়িয়ে ধরলো। সূর্য ও বিষ্ণুর জয়ধ্বনিতে পদ্মক্ষেত্র মুখরিত হয়ে উঠলো—বারো 'শ শিল্পী নত মস্তকে বারো বছরের বালককে আশীর্বাদ করলেন।

অবশেষে মন্দির শেষ হলো—বারো বছর ধরে বুকের ওপর চেপে থাকা পাথর সরে গেলো। উষা লগ্নে শিবিরে শিবিরে আনন্দের ঢেউ বইতে লাগলো।

কিন্তু সে-আনন্দ মাত্র কিছুক্ষণের জন্য। একটু পরেই সবার মুখে অনাগত বিপদের ছায়া নেমে এলো।

কিশোর ধর্মপাদ এর কারণ জানতে চাইলো।

বিশিষ্ট শিল্পীরা বিষণ্ণ মুখে বললেন, "তুমি এক-শ বছর বেঁচে থেকে বহু মন্দিরের স্রষ্টা হও। তোমার আজকের কীর্তি গোপন থাকবে না—রাজার কানে খবরটা যাবেই। তিনি অবশ্যই তোমাকে পুরস্কৃত করবেন, আর আমাদের জন্যে কী শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে

তা তো আমরা জানি।”

খুব মন খারাপ হয়ে গেলো ধর্মপাদের। “তাতে আমার কোনো লাভ হবে না। আমার পুরস্কার পাওয়া যদি আমার আপনজনদের মৃত্যুর কারণ হয় তা হলে সে পুরস্কার কোনো কাজে লাগবে না। এই আশ্চর্য মন্দির, ষোড়শদল পদ্মের মতো এই অসাধারণ স্থাপত্যকর্ম আপনাদেরই সৃষ্টি, আমি কেবল মন্দিরের মাথায় শেষ পাথরটি বসিয়ে দিয়েছি। না, আমার কোনো পুরস্কারের প্রয়োজন নেই, এই বলে চোখ মুছতে মুছতে ধর্মপাদ দূরে সরে গেলো।”

ধর্মপাদ মন্দিরের এক কোণে বসে বসে ভাবলো, “যদি আমার বাবা এবং প্রিয়জনরা আমার জন্যেই চরম বিপদে পড়েন তা হলে এই জীবনের মূল্য কী? একটি প্রাণের বিনিময়ে যদি এতোগুলো পরিবার রক্ষা পায় তা হলে তাই ভাল।”

ধর্মপাদ কারুর সঙ্গে কোনো কথা না বলে সবার অলক্ষ্যে মন্দির শীর্ষে উঠে গেলো।

প্রভাত সূর্যের সোনালি আলো তখন সবেমাত্র সূর্যমন্দিরের চূড়ায় এসে পড়েছে। বাবাকে মনে মনে প্রণাম জানিয়ে বারো বছরের ছেলে মৃত্যুকে বরণ করবার জন্যে ওখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

“নিজেকে বিসর্জন দিয়ে ধর্মপাদ বাবাকে এবং বহু লোককে রক্ষা করলো।” গল্প শেষ করতে গিয়ে ছোটমামা লক্ষ্য করলেন, বুলবুল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তিলক ও শিবাজীর চোখও শুকনো নেই।

ছোটমামা বললেন, "মাত্র বারো বছর বয়সে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অমর হয়ে রইলো ধর্মপাদ। শতশত বছরের দূরত্ব পেরিয়ে তার কথা আজও ওড়িষার মানুষ সস্নেহে এবং সগর্বে স্মরণ করে।"

তিনটি ছেলেমেয়ের দুঃখ তবু শেষ হয় না। তারা কেঁদেই চলেছে। ছোটমামা কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না।

এমন সময় হৈ-হৈ করে তিলক, শিবাজী ও বুলবুলের মা বাড়ি ফিরলেন। সমস্ত বাজারহাট এবং বিয়ের সব নেমন্তন্ন তাঁরা সেরে ফেলেছেন।

ওঁরা তিনজন ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলেন। "হ্যাঁরে, কী হলো তোদের? কাঁদছিস কেন? ছোটমামা তোদের বকাবকি করেছে? নিশ্চয় খুব দুষ্টুমি করছিলি।" তিন মা এক সঙ্গে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন।

তিন দিদির দিকে মুখ ফিরিয়ে ছোটমামা বললেন, "এইসব হীরের টুকরো ছেলেমেয়েকে কোন্ দুঃখে আমি বকতে যাবো? গল্পময় ভারতের সঙ্গে আমি ওদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলাম।"

তিলক, শিবাজী ও বুলবুল এবার নিজেদের সামলে নিয়ে প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠলো, "ছোটমামা, তুমি যেসব গল্প আজ বললে তা চিরকাল আমাদের মনে থাকবে।"